Peace

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ (স.) এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন

Peace Publication

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication

রাসূলুল্লাহ -এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন

সংকলনে

মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম

সম্পাদনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী (প্রথম)
এম.এম, এম.এফ, এম.এ (প্রথম শ্রেণী)
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও: আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।

Peace Publication

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কুরআন ও হাদীসের আলোকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন

প্রকাশক

মো: রফিকুল ইসলাম

প্রকাশনায় : পিস পাবলিকেশন

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট, ঢাকা - ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৫৭৬৮২০৯

প্রকাশকাল : এপ্রিল - ২০১১ ইং

দ্বিতীয় সংস্করণ : নভেম্বর - ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাধাঁই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

৪/৬ জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা।

সম্পাদকীয়

সমুদয় প্রশংসার শির অবনত করছি মহান রাব্বুল আ'লামীনের জন্য, যিনি তাঁর একান্ত মেহেরবাণীতে **'কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন'** নামক গ্রন্থটি সম্পাদনা করার তাওফিক দান করেছেন। দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রাসূল ﷺ-এর উপর। শহীদ ভাইদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

'কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন' নামক এ মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। রাসূল ﷺ-এর বাস্তব জীবন জানা একজন মুসলিমের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাসূল ﷺ-এর বাস্তব জীবন জেনে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করার জন্য তাঁর ২৫ বছর থেকে শুরু করে ৬৩ বছর পর্যন্ত প্রায় ৩৮ বছরের পারিবারিক জীবনে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার কারণ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পবিত্র স্ত্রীদের সাথে কেমন ছিল তাঁর আচার-আচরণ, রাসূল ﷺ-এর পবিত্র মুখনি:সৃত বাণী সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারে তাঁদের মূল্যবান অবদান এবং বিশেষ করে রাসূল ﷺ-এর সাথে পবিত্র সাহচর্য লাভ ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করাও প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরজ।

এ বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত পরিমাণে তাত্ত্বিক কোন গ্রন্থ না থাকায় আমরা অনেক দিন থেকে এ রকম একটি মূল্যবান গ্রন্থ সম্পাদনের চেষ্টা করছি। বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের নিরীখে কুরআন ও হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর

পবিত্র স্ত্রীগণের জীবনী ও মানবতার জন্যে তাঁদের অবদান ও হাদীসশাস্ত্রে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের যে সমাবেশ ঘটেছে তা জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পেরে নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্বের কিয়দাংশ হলেও আদায় করতে পেরেছি বলে মনে করছি।

পরিশেষে, এ মহান কাজে যারা সময় ও শ্রম কুরবানী করেছেন তাদের কৃতজ্ঞতা জানাই। পাঠকদের সুচিন্তিত পরামর্শ পরবর্তী সংস্করণে প্রতিফলিত হবে বলে প্রতিশ্রুতি রইল। বইটি ভালো হলে অন্তত একজনকে বলুন, আর অভিযোগ থাকলে আমাদের বলুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণের জীবনী জেনে তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে বাস্তব জীবনে প্রতিফলনের তাওফিক দান করুন। আমিন ॥

সূচিপত্র

০১.	উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)	১১
০২.	উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)	২৮
০৩.	উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)	৩৬
০৪.	উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)	৯৩
০৫.	উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা)	১০৬
০৬.	উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)	১০৯
০৭.	উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)	১২৭
০৮.	উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া (রা)	১৩৭
০৯.	উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা)	১৪৩
১০.	উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যা (রা)	১৫০
১১.	উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)	১৫৭
১২.	উম্মুল মু'মিনীন রায়হানা (রা)	১৬৩
১৩.	উম্মুল মু'মিনীন মারিয়া কিবতিয়া (রা)	১৬৬
	নবী কারীম ﷺ-এর বহু বিবাহের সমালোচনার প্রতিবাদ	১৭০

এক নজরে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র স্ত্রীগণ

ক্রম	নাম	জন্ম	রাসূলের সাথে বিয়েকালীন বয়স	বিয়েকালীন রাসূলের বয়স	প্রস্তাবক	মহরানা	সম্পর্ক	বিয়ে নং	বিয়ে করার কারণ	বর্ণিত হাদীস	রাসূলের সাথে দাম্পত্যকাল	ওফাত
০১	খাদীজা (রা)	হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে	৪০	২৫	নাফিসা বিনতে মারিয়া	৫০০ স্বর্ণমুদ্রা	ফুফু	৩য়	অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক		২৫ বছর	নবুওয়াতের দশম বছর
০২	সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)	৫৬৫/৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে	৫০/৫৫	৫০	খাওলা বিনতে হাকিম	৪০০ দিরহাম	খালাতো বোন	২য়	মানবিক	৫টি	১৩ বছর	২২ হিজরীতে
০৩	আয়েশা (রা)	নবুয়্যাতের ৩/৪ বছর পরে	৬/৭/৮/৯	৫১	খাওলা বিনতে হাকিম	৫০০ দিরহাম		১ম	অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক	২২১০ টি	৯ বছর	৫৮ হিজরীতে
০৪	হাফসা (রা)	নবুয়্যাতের ৫ বছর পূর্বে	১৯	৫৪	রাসূল নিজেই			২য়	অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক	৬০টি	১২ বছর	হিজরী ৪৫ সনে
০৫	যয়নব বিনতে খুজাইমা (রা)	নবুয়্যাতের ২৬ বছর পূর্বে	৪১	৫৫	যয়নব নিজেই	৪০০ দিরহাম		৩য়	মানবিক		২/৩ মাস	হিজরী ৩য় /৪র্থ সনে
০৬	উম্মে সালামা (রা)	নবুয়্যাতের ১৩ বছর পূর্বে	৩১	৫৬	উমর (রা)			২য়	মানবিক ও রাজনৈতিক	৩৭৮ টি	৮ বছর	৬৩ হিজরীতে
০৭	যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)	নবুয়্যাতের ২০ বছর পূর্বে	৩৮	৫৭	যায়েদ		আপন ফুফাত বোন	২য়	সামাজিক কুপ্রথার মূলৎপাটনে	১১টি	৭ বছর	হিজরী ২০ সালে
০৮	জুয়াইরিয়া (রা)	হিজরতের ১৫ বছর আগে	২১	৫৭	রাসূল নিজেই			২য়	অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক	৭টি	৭ বছর	হিজরী ৫০ সালে
০৯	উম্মে হাবীবা (রা)	নবুয়্যাতের ১৭ বছর পূর্বে	৩৬/৩৭	৫৭	আব্বাস ইবনে উমাইয়া	৪০০ দিরহাম		২য়	রাজনৈতিক ও মানবিক	৬৫টি	৭ বছর	হিজরী ৪৪ সনে
১০	সুফিয়া (রা)	নবুয়্যাতের ২ বছর আগে	২০	৫৮	সুফিয়া নিজেই			৩য়	মানবিক	১০টি	৬ বছর	হিজরী ৫০ সন
১১	মায়মুনা (রা)	৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে	২৯	৫৮	আব্বাস (রা)	৫০০ দিরহাম	খালা	৩য়	মানবিক	৭৬টি	৫ বছর	৬১ হিজরীতে
১২	রায়হানা (রা)	নবুয়্যাতের ৭ বছর পূর্বে	২৫	৫৮	রাসূল নিজেই	৪০০ দিরহাম		২য়	রাজনৈতিক		৫বছর	রাসূলের ওফাতের ১০ মাস পূর্বে
১৩	মারিয়া কিবতিয়া (রা)	নবুয়্যাতের ৬ বছর পূর্বে	২৫	৫৮	রাসূল নিজেই				রাজনৈতিক		৫ বছর	হিজরী ১৩ সাল

১. উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রা)

"আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন"।

١. عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ اَتٰى جِبْرِيْلُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَذِهِ خَدِيْجَةُ قَدْ اَتَتْ مَعَهَا اِنَاءٌ فِيْهِ اِدَامٌ اَوْ طَعَامٌ اَوْ شَرَابٌ فَاِذَا هِىَ اَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّىْ وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ صَخَبَ فِيْهِ وَلاَ نَصَبَ ـ

১. আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জিবরাঈল (আ) নবী করীম ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঐ যে খাদীজা (রা) একটি পাত্র হাতে নিয়ে আসছেন। ঐ পাত্রে তরকারী অথবা খাদ্যদ্রব্য অথবা পানীয় ছিল। যখন তিনি পৌঁছে যাবেন তখন তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম জানাবেন। আর তাঁকে জান্নাতের এমন একটি ভবনের সুসংবাদ দিবেন যার অভ্যন্তর ভাগ ফাঁকা-মোতি দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। সেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোরগোল; কোন প্রকার দুঃখ-ক্লেশ।

(বুখারী : হাদীস নং-৩৮২০)

খাদীজা (রা)-কে নবী করীম ﷺ জান্নাতে একটি গৃহের সুসংবাদ দিয়েছেন।

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ بَشَّرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَدِيْجَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ ـ

২. আয়েশা সিদ্দিকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ খাদীজা (রা)-কে জান্নাতে একটি ঘরের সুসংবাদ দিয়েছেন।

(মুসলিম : হাদীস নং-৬২৭৬, কিতাবুল ফাযায়েল, বাব মিন ফাযায়েল খাদীজা)

মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ ﷺ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া জান্নাতী রমণীদের সরদার হবে।

٣. عَنْ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيِّدَاتُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَعْدَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ فَاطِمَةُ وَخَدِيْجَةُ وَاٰسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ.

৩. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জান্নাতী রমণীদের সরদার মারইয়াম বিনতে ইমরান এর পরে ফাতেমা, খাদীজা ও ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া।

(তাবরানী : সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী; হাদীস নং-১৪৩৪))

নাম ও উপনাম : তাঁর নাম 'খাদীজা', ডাক নাম 'উম্মুল হিন্দ', তাঁর প্রথম স্বামী আবুল হালার ঔরসে হিনদ নামক তাঁর এক পুত্র ছিল, তার নাম অনুসারে খাদীজা (রা)-এর উপনাম হয় উম্মুল হিনদ।

জন্ম : তিনি নবী করীম ﷺ-এর প্রথমা স্ত্রী। প্রথম মুসলমান উম্মুল মু'মিনীনদের প্রধান খাদীজাতুল কুবরা (রা) ৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ হস্তী বছরের ১৫ বছর পূর্বে মক্কার সম্মানিত গোত্র আসাদ ইবনে আবদিল উযযায় জন্মগ্রহণ করেন। সে হিসেবে তিনি বয়সে রাসূল ﷺ-এর ১৫ বছরের বড় ছিলেন।

মাতা-পিতা ও পূর্বপুরুষ : পিতার নাম খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা ইবনে কুসাই, মায়ের নাম ফাতিমা বিনতে যায়িদাহ। আর নানা ছিলেন আসাম ইবনে হারাম ইবনে ওয়াহাব ইবনে হাজার ইবনে আবদ ইবনে মাইছ ইবনে আমের। তাঁর নানীর নাম হালাহ বিনতে আবদে মানাফ। উল্লেখ্য যে, কয়েক পুরুষ ওপরে গিয়ে খাদীজা (রা)-এর পিতৃকূল ও মাতৃকূল এক ছিল। অর্থাৎ তাঁর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ এবং নবী করীম ﷺ-এর উর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ একই ব্যক্তি ছিলেন। এ ব্যক্তির নাম ছিল কুসাই। পৈত্রিক বংশের দিক দিয়ে খাদীজা রাসূল ﷺ-এর ফুফু হতেন। নবুওয়্যাতের সূচনায় খাদীজা তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফাল-এর নিকট রাসূল ﷺ সম্পর্কে যে উক্তি

করেছিলেন "আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন" তা এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই। তাহলে বুঝা গেল খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা) ছিলেন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ কুরাইশ বংশের পূত পবিত্র সন্তান।

গোত্র : তাঁর গোত্র আসাদ ইবনে আব্দুল উযযা কুরাইশদের সেই নয়টি বিশিষ্ট গোত্রের অন্যতম ছিল, যাদের মধ্যে দশটি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গৌরবজনক দায়িত্ব ছিল। পরামর্শ এ গোত্রের দায়িত্বে রয়েছে বিধায় 'দারুণ নাদওয়া' এর ব্যবস্থাপনা ছিল তাদের অধীনস্থ। পরামর্শ অর্থ হলো কুরাইশদের যখন কোন জাতীয় অথবা রাষ্ট্রীয় সমস্যা দেখা দিত এবং তারা ঐক্যবদ্ধভাবে কোন কাজ করতে মনস্থ করত তখন সুপরামর্শের জন্য এ গোত্রের নিকট আগমন করত। এ পদে সর্বশেষ অধিষ্ঠিত ব্যক্তি ছিলেন যায়েদ ইবনে যাম'আ ইবনে আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব ইবনে আসাদ। কুরাইশরা তাদের সমস্যাবলী তাঁর নিকট পেশ করত। তিনি যদি তাদের সাথে একমত পোষণ করতেন তাহলে বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হতো নতুবা তাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিত। কুরাইশগণ পুনরায় চেষ্টা করে তাকে তাদের মতাবলম্বী করে নিত। এ হতে কুরাইশদের মধ্যে তাঁর প্রভাব কেমন তা উপলব্ধি করা যায়।

উপাধি : উপাধি 'তাহিরা' (طَاهِرَةٌ) অর্থাৎ পবিত্রা নারী। খাদীজা (রা) তৎকালীন আরবে অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্না ও সম্মানিতা একজন মহিলা হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতা ছিলেন। সে জাহেলী যুগেও তাঁর পূত পবিত্র চরিত্রের জন্য তিনি 'তাহিরা' উপাধিতে ভূষিতা হন।

তিনিই রাসূল ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী, নবী নন্দিনী ফাতিমাতুজ জোহরার মা, ইনিই হাসান ও হোসাইন (রা)-এর নানী এবং তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী।

খাদীজা (রা)-এর বাল্যকাল সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানা যায় না। তবে রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ে হবার পূর্বে তাঁর আরও দু'বার বিয়ে হয়েছিল। এরও পূর্বে খাদীজা (রা)-এর পিতা খুওয়াইলিদ তাঁকে বিয়ে দেয়ার জন্য সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবনে নাওফিলের সাথে সম্বন্ধ ঠিক করেন। ওয়ারাকা খাদীজার চাচাত ভাই ছিলেন। কিন্তু যে কোন কারণে সে বিয়ে করেনি।

প্রথম বিবাহ : খাদীজা (রা)-এর প্রথম বিবাহ হয় আবূ হালা হিনদ ইবন যুরারা ইবনে নাব্বাশ ইবনে 'আদিয়্যি আত-তামীমীর সাথে (ইবন হাযম জামহারাতু আনসাবিল-আরাব, পৃ. ২১০)। তাঁর নাম সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ কেহ নামনাশ ইবনে যুরার আবার কেহ কেহ নাব্বাশ ইবনে মুরারা বলে বর্ণনা করেছেন। ইবনে সাদ হিনদ ইবনে নাব্বাশ ইবনে যুরারা বলে উল্লেখ করেছেন। আবূ হালার দাদা নাব্বাশ তার গোত্রের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি মক্কায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বনূ 'আবদি' ইবনে কুসায়্যির সাথে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করেন। কুরাইশদের রীতি ছিল যে, তারা মিত্রদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করত। তাই খাদীজা (রা)-এর সাথে আবূ হালার সম্পর্ক কুরাইশদের সমপর্যায়ের ছিল। তারাও মুদার গোত্রভুক্ত ছিল। এ জন্য তাদের সাথে আত্মীয়তা করা কোনরূপ অবমাননাকর ছিল না। এ স্বামীর ঔরসে খাদীজা (রা)-এর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে ২ (দুই) পুত্র হিনদ ও আল হারিছ এবং যয়নব নামক এক কন্যা। খাদীজার প্রথম পুত্র ও প্রথম সন্তান হল হিনদ। যিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট লালিত-পালিত হন। এজন্য তাকে রাবীবু রাসূলিল্লাহ رَبِيبُ رَسُوْلِ اللهِ বা রাসূল ﷺ-এর পালক পুত্র বলা হতো।

এ হিনদ ইসলাম গ্রহণ করে উহুদ বা বদর যুদ্ধে শরীক হন এবং পরে বসরায় ইন্তেকাল করেন। রাসূল ﷺ নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর খাদীজা (রা)-এর এ পুত্র দু'জনই ইসলাম কবুল করেন এবং সম্মানিত সাহাবা হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু তাদের পিতা আবূ হালা ইবনে যাররাহ সে জাহেলী যুগেই ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় বিবাহ : খাদীজা (রা)-এর স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয় 'আতীক ইবনে 'আ'ইয (ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 'উমর ইবনে মাখযুম)-এর সাথে। খাদীজা (রা)-এর গর্ভে তাঁর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে যিনি উম্মু মুহাম্মদ উপনামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন (জামহারাতু আনসাবিল আরাব, পৃ. ১৪২)। ইবনে সাদ আইয-এর স্থলে আবিদ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মাখযুম গোত্রের লোক ছিলেন এবং আবূ জাহেল উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা) ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-এর চাচা ছিলেন। খাদীজা (রা)-এর গোত্রের সাথে এ গোত্রের এ দিক থেকে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যে, উম্মে সালামা (রা)-এর সহোদরা

কারীবা বিনতে আবী উমাইয়্যার সাথে যাম'আ ইবনে আসওয়াদ এর বিবাহ হয় এবং যায়েদ ইবনে যাম'আ তাঁদের পুত্র।

দ্বিতীয় স্বামী আতিকের মৃত্যু হলে তিনি বিশেষভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

পিতার ইনতিকাল : খাদীজা (রা)-এর বয়স আনুমানিক পঁয়ত্রিশ বছরের সময় তাঁর পিতা খুওয়াইলিদ ইনতিকাল করেন। ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ফুজ্জার যুদ্ধে ইনতিকাল করেন।

খাদীজার ব্যবসায়িক অবস্থা : ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন যে, আরবের সে জাহেলী যুগে মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদশালী ব্যবসায়ী ছিলেন খাদীজাতুল কুবরা (রা)। জানা যায়, তাঁর বাণিজ্য বহর নিয়ে যখন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করত তখন দেখা যেতো একা খাদীজার পণ্যসামগ্রী কুরাইশদের সমগ্র পণ্যসামগ্রীর সমান।

পিতার মৃত্যুর পর খাদীজা (রা)-এর পক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ তাঁর পিতার ব্যবসায় আরবের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। এজন্য তিনি একজন বিশ্বস্ত লোক খুঁজতে লাগলেন যাতে তাঁর ব্যবসায় দেশের বাইরেও সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।

বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী রাসূল ﷺ : নবী করীম ﷺ তখন ২৫ বছরের যুবক। ইতোমধ্যেই তিনি তাঁর চাচা আবূ তালিবের সাথে কয়েকবার বাণিজ্য সফরে গিয়ে প্রভূত সাফল্য বয়ে এনেছিলেন। সাথে সাথে ব্যবসায় সম্পর্কিত পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমে জড়িত হওয়ার কারণে সর্বোপরি ঐ বয়সেই 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত হওয়ায় সমগ্র আরবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার কথা খাদীজা (রা)-এর কানেও পৌঁছতে দেরী হয়নি।

বিশ্বস্ত লোকের খোঁজে খাদীজা : এদিকে খাদীজা (রা) তাঁর ব্যবসায় পরিচালনা করার জন্য বিশ্বস্ত লোক খুঁজছেন জানতে পেরে রাসূল ﷺ-এর চাচা আবূ তালিব তাঁকে ডেকে বললেন, 'ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, সময়টাও খুব সংকটজনক। মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোনো

ব্যবসায় বা অন্য কোনো উপায়-উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তাঁর পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছেন। তুমি যদি তাঁর কাছে যেতে, হয়তো তোমাকেই তিনি নির্বাচিত করতেন। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তাঁর ভালো করেই জানা আছে।' চাচা আবূ তালিবের প্রস্তাবের জবাবে রাসূল ﷺ বললেন, 'সম্ভবত তিনি নিজেই লোক পাঠাবেন।'

দেখা গেল সত্যি সত্যিই খাদীজা (রা) লোক পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, 'মুহাম্মদ ﷺ যদি তাঁর ব্যবসায় পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান তাহলে তাঁকে অন্যদের তুলনায় দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন।' রাসূল ﷺ তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

পাদ্রীর ভবিষ্যৎ বাণী : রাসূল ﷺ সিরিয়ার পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়ার জন্য বাণিজ্য কাফেলা নামিয়ে বসলেন। সঙ্গে ছিলেন খাদীজা (রা)-এর বিশ্বস্ত দাস মাইসারা। এ সময় গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে এসে মাইসারাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?' মাইসারা বললেন, ইনি মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের লোক। এ কথা শুনার পর পাদ্রী বললেন, ইনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' ঐ পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা। অবশ্য কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন ঐ পাদ্রীর নাম ছিল 'নাসতুরা'।'

রাসূল ﷺ-এর প্রাথমিক সফলতা : রাসূল ﷺ সিরিয়ার বাজারে গিয়ে যথাসম্ভব উচ্চমূল্যে পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে প্রয়োজনীয় মালামাল ও জিনিসপত্র কম মূল্যে ক্রয় করলেন। তারপর সঙ্গী মাইসারাকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথ চলতে চলতে মাইসারা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন, 'নবী করীম ﷺ তাঁর উটের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফেরেশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদ থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর মাথার ওপর ছায়া বিস্তার করে আছে।' এভাবে তাঁরা মক্কায় ফিরলেন। ঘরে ফিরেই মাইসারা তাঁর মালিক খাদীজা (রা)-কে পাদ্রীর মন্তব্য ও পথের সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে খুলে বললেন।

মক্কায় ফিরে সিরিয়া থেকে আনা পণ্য-সামগ্রী বিক্রি করে রাসূল ﷺ দেখলেন এ যাত্রায় প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জিত হয়েছে। তিনি সমস্ত হিসাব-নিকাশ খাদীজা (রা)-কে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

খাদীজার বিয়ের প্রস্তাব : সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ সর্বোপরি অসম্ভব ভদ্র মহিলা ছিলেন খাদীজা (রা)। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বিধবা। যে কারণে মক্কার অনেক সম্ভ্রান্ত কুরাইশ যুবক তাঁকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। তাদের অনেকে প্রস্তাবও পাঠিয়েছিলেন। সে সব প্রস্তাব খাদীজা (রা) বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর অনুগত ও প্রিয় দাস মাইসারার নিকট রাসূল ﷺ-এর সম্বন্ধে তাঁর ব্যবসায়িক আমানতদারিতা ও বিশ্বস্ততার বিস্তারিত বিবরণ জানার পর ইয়ালার স্ত্রী ও খাদীজা (রা)-এর বান্ধবী 'নাফিসা বিনতে মারিয়া'র মাধ্যমে রাসূল ﷺ-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। নাফিসা রাসূল ﷺ-এর নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন : 'আপনাকে যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহ্বান জানানো হয়, আপনি কি গ্রহণ করবেন?

এখানে সকলের অবগতির জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখি, আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে আরবের সে জাহেলী যুগেও মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামতের স্বাধীনতা ছিল। তারা নিজেদের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে নিজেরা সরাসরি কথা বলতে পারতো। প্রাপ্তবয়স্কা ও অপ্রাপ্তবয়স্কা সবাই সমভাবে এ অধিকার ভোগ করতো।

শুভ বিবাহ সম্পন্ন : রাসূল ﷺ খাদীজা (রা)-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব পাওয়ার পর সিদ্ধান্তহীনতায় ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয় চাচা আবু তালিব এর পরামর্শে খাদীজা (রা)-কে বিয়ে করার সম্মতি প্রদান করেন। রাসূল ﷺ সম্মতি দেয়ার পর খাদীজা (রা)-এর চাচা আমর বিন আসাদের পরামর্শে পাঁচশ স্বর্ণমুদ্রা দেনমোহর ধার্য করে বিবাহের দিন-তারিখ ঠিক করা হয়।

বিয়ের দিন রাসূল ﷺ -এর পক্ষ থেকে খাদীজা (রা)-এর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন আবূ তালিব, হামজা (রা)-সহ তাঁর বংশের আরো কিছু সম্মানিত লোক। খাদীজার পক্ষ থেকেও বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। উভয়পক্ষের বিশিষ্ট মেহমানদের উপস্থিতিতে আবূ তালিব প্রাণপ্রিয় ভাতিজার বিয়ের খুতবা পাঠ করেন এবং বিয়ে পড়ান। এ সময়ে নবী করীম ﷺ -এর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর, আর খাদীজা (রা)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

নবুওয়াত লাভ : এ বিয়ের ১৫ বছর পর অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর বয়স যখন ৪০ বছর তখন তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। হেরা গুহায় প্রথম অহী নাযিলের বিষয়টি সর্বপ্রথম তিনি খাদীজা (রা)-কে জানান। খাদীজা (রা) তো তাঁর বিয়ের পূর্ব

থেকেই রাসূল ﷺ-এর নবী হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। যে কারণে তিনি বিষয়টি সহজে সামলে নিতে পেরেছিলেন। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফের ৩নং হাদীসখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ (رضـ) أَنَّهَا قَالَتْ : أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لاَ يَرٰى رُؤْيَا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ اِلَيْهِ الْخَلاَءُ وَكَانَ يَخْلُوْ بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيْهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ اَنْ يَّنْزِعَ اِلٰى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ اِلٰى خَدِيْجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتّٰى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِيْ غَارِ حِرَاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ : اِقْرَأْ قَالَ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ : فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِيْ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ : اِقْرَأْ قُلْتُ : مَا اَنَا بِقَارِئٍ، فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتّٰى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ اِقْرَأْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِقَارِئٍ فَاَخَذَنِيْ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ اَرْسَلَنِيْ فَقَالَ : اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ـ فَرَجَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ ، فَدَخَلَ عَلٰى خَدِيْجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ (رضـ) فَقَالَ : زَمِّلُوْنِيْ، زَمِّلُوْنِيْ ـ فَزَمَّلُوْهُ حَتّٰى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ فَقَالَ لِخَدِيْجَةَ ـ وَاَخْبَرَهَا الْخَبَرَ ـ لَقَدْ خَشِيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ ـ فَقَالَتْ لَهُ خَدِيْجَةُ : كَلاَّ وَاللّٰهِ ! مَا يُخْزِيْكَ اللّٰهُ اَبَدًا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ وَتَقْرِي

الضَّيْفَ وَتُعِيْنُ عَلٰى نَوَائِبِ الْحَقِّ فَانْطَلَقَتْ بِهٖ خَدِيْجَةُ حَتّٰى
اَتَتْ بِهٖ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ ابْنِ اَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى ابْنَ عَمِّ خَدِيْجَةَ
وَكَانَ امْرَءً قَدْ تَنَصَّرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ
الْعِبْرَانِىَّ فَيَكْتُبُ مِنَ الْاِنْجِيْلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ
يَّكْتُبَ وَكَانَ شَيْخًا كَبِيْرًا قَدْ عَمِىَ فَقَالَتْ لَهٗ خَدِيْجَةُ : يَا
ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ اَخِيْكَ فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ اَخِىْ مَاذَا
تَرٰى ؟ فَاَخْبَرَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَبْرَ مَا رَاٰى فَقَالَ لَهٗ وَرَقَةُ : هٰذَا
النَّامُوْسُ الَّذِىْ نَزَّلَ اللّٰهُ عَلٰى مُوْسٰى يَا لَيْتَنِىْ فِيْهَا جَذَعًا
لَيْتَنِىْ اَكُوْنُ حَيًّا اِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَ
مُخْرِجِىَّ هُمْ ؟ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَاْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهٖ اِلاَّ
عُوْدِىَ وَاِنْ يُّدْرِكْنِىْ يَوْمُكَ اَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ
وَرَقَةُ اَنْ تُوُفِّىَ وَفَتَرَ الْوَحْىُ

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্নরূপে। যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি 'হেরা'র গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া– এভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক রাত ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন।

তারপর খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 'হেরা' গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে ওহী এলো। তাঁর কাছে ফেরেশতা এসে বললেন, 'পড়ুন'। তিনি বললেন : আমি তো পড়তে পারি না। রাসূল ﷺ বললেন, তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। এরপর তিনি

আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন : 'পড়ুন'। আমি উত্তর দিলাম 'আমি তো পড়তে পারি না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'রক্তপিণ্ড থেকে। পড়ুন, আর আপনার রব মহিমান্বিত।"

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিরে এলেন। তাঁর অন্তর কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত খুওয়াইলিদের কাছে এসে বললেন, 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও', 'আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।' তাঁরা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। তখন তিনি খাদীজা (রা)-এর কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাঁকে বললেন, আমি আমার নিজের ওপর আশঙ্কা বোধ করছি।

খাদীজা (রা) বললেন, আল্লাহর কসম, কখনো না। আল্লাহ্ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সহযোগিতা করেন, মেহমানের মেহমানদারী করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা (রা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল ইব্ন 'আবদুল আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে 'খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতে জানতেন এবং আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইনজীল থেকে অনুবাদ করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, 'হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাতিজা! তুমি কী দেখ?' রাসূলুল্লাহ ﷺ যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন। তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, 'ইনি সে দূত যাঁকে আল্লাহ্ মূসা (আ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তারা কি আমাকে বের করে দেবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, অতীতে যিনিই তোমার মতো কিছু নিয়ে এসেছেন তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে

তোমাকে প্রবলভাবে সাহায্য করব।' এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা (রা) ইন্তেকাল করেন। আর ওহী স্থগিত থাকে।

খাদীজার ইসলাম গ্রহণ : ওহী সূচনার এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় খাদীজা (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। ইসলাম গ্রহণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, খাদীজা ইসলাম গ্রহণ করার ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ওপর এক বিরাট ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাঁর বংশধর এবং শুভানুধ্যায়ী ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে খাদীজা (রা) পুরোপুরি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুসরণ করা শুরু করেন। সালাত ফরজ হওয়ার পূর্ব থেকেই তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঘরের ভেতর সালাত আদায় করতেন। এ অবস্থা একদিন বালক আলী দেখে ফেলেন এবং জিজ্ঞেস করেন; 'মুহাম্মদ এ কী?' রাসূল ﷺ এ সময় নতুন দ্বীনের দাওয়াত আলী (রা)-এর কাছে পেশ করেন এবং বিষয়টি গোপন রাখার জন্য বলেন। এ সময় ইসলামের অবস্থা ছিল আফীক আল কিন্দীর ভাষায়, 'আমি জাহেলী যুগে মক্কায় এসেছিলাম স্ত্রীর জন্য আতর এবং কাপড়-চোপড় ক্রয় করতে, সেখানে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নিকট অবস্থান করি।

ভোরবেলা কা'বা শরীফের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। আব্বাসও আমার সাথে ছিলেন। এ সময় একজন যুবক আগমন করেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর একজন নারী ও একজন শিশু এসে তার পিছনে দাঁড়ায়। এরা দু'জন যুবকটির পেছনে সালাত আদায় করে চলে যায়। তখন আমি আব্বাসকে বললাম, 'আব্বাস! আমি লক্ষ্য করছি, এক বিরাট বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে।' আব্বাস বললেন, 'তুমি কি জান, এ যুবক এবং মহিলাটি কে?' আমি জবাব দিলাম, 'না'। তিনি বললেন, 'যুবকটি হচ্ছে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। আর শিশুটি হচ্ছে আলী ইবনে আবূ তালিব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। যে নারীকে তুমি সালাত আদায় করতে দেখেছ, তিনি হচ্ছেন আমার ভাতিজা মুহাম্মদ-এর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ।

আমার ভাতিজার ধারণা, তার ধর্ম খাছ একনিষ্ঠ ধর্ম এবং সে যা কিছু করছে আল্লাহর হুকুমেই করছে। যতদূর আমার জানা আছে, সারা দুনিয়ায় এ তিনজন ছাড়া আর কেউ তাদের দ্বীনের অনুসারী নেই। এ কথা শুনে আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জাগে যে, চতুর্থ ব্যক্তি যদি আমি হতাম।' (তাবাকাত ৮ম খণ্ড, পৃ-১১)।

খাদীজা (রা) তৎকালীন সময়ে আরবের একজন প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। ফলে তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তার পিতৃকূলের লোকদের ওপরও পড়ে। জানা যায় তাঁর পিতৃকূলে বনূ আসাদ ইবনে আবদুল উযযার জীবিত পনের জন বিখ্যাত ব্যক্তির দশজনই ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেন। এর মধ্যে খাদীজার ভাতিজা হিযামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবা হাকীম জাহেলী যুগে মক্কার 'দারুন নাদওয়া' পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। অপর ভাতিজা আওয়ামের পুত্র প্রখ্যাত সাহাবী যুবাইর (রা)। এ যুবাইর (রা)-এর মা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর আপন ফুফু। খাদীজা (রা)-এর এক বোন হালা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর মেয়ে যয়নাব (রা)-এর স্বামী আবূল আস ইবনে রাবী'র মা। এ হালাও ইসলাম কবুল করেছিলেন। মোট কথা খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তার বংশের ছোট-বড় অনেকে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ করেন আবার অনেকে ইসলাম সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে থাকেন।

জীবনচরিত : খাদীজা (রা) সে সম্মানিতা মহিলা যিনি নবীজীর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির সুসংবাদ প্রথম শুনেছিলেন। তিনি নির্দ্বিধায় সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর নবুওয়্যাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং ইসলাম কবুল করেছিলেন। সাথে সাথে তাঁর সমস্ত অর্থ সম্পদ রাসূল ﷺ-এর হাতে সোপর্দ করেছিলেন তাঁর ইচ্ছে অনুযায়ী খরচ করার জন্য। রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর ২৫ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি রাসূল ﷺ-এর বিপদে আপদে সুখে-দু:খে সর্বোত্তম বন্ধুর ভূমিকা পালন করেছেন। একজন শান্ত্বনা ধাত্রী হিসেবে সময়ে-অসময়ে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন জীবন-মরণ বাজি রেখে।

রাসূল ﷺ নিজেও খাদীজা (রা)-কে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। যে কারণে নিজের থেকে ১৫ বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও খাদীজা (রা) জীবিত থাকা অবস্থায় তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। রাসূল ﷺ খাদীজা (রা)-কে কেমন ভালোবাসতেন তা আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা থেকে ধারণা করা যায়। তিনি বলেন, 'খাদীজার প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা ছিল রাসূল ﷺ-এর অন্য কোন স্ত্রীর প্রতি ততটা ছিল না। একদিন রাসূলে করীম ﷺ আমার সামনে তাঁর কথা উল্লেখ করলে আমি ঈর্ষান্বিত হয়ে বলি, 'সে তো ছিল বৃদ্ধা স্ত্রী, এখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করেছেন; তবুও আপনি তার কথা কেন স্মরণ করছেন?' আমার কথা শুনে আল্লাহর রাসূল ক্রুদ্ধ হন। রাগে তাঁর

পশম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'আল্লাহর কসম, তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি পাইনি। যখন সকলে ছিল কাফির, তখন সে ঈমান এনেছিল। যখন সকলে আমাকে অবিশ্বাস করেছিল, তখন সে আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল। যখন সকলে আমাকে ত্যাগ করেছিল, তখন সে অর্থ-সম্পদ দিয়ে আমার সহায়তা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর গর্ভেই আমাকে সন্তান দান করেছেন।'

আয়েশা (রা) বলেন, 'এরপর আমি অন্তরে অন্তরে বলি-ভবিষ্যতে আমি কখনো খারাপ অর্থে তাঁর নাম মুখে নেবো না।'

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও খাদীজা ছিলেন অতুলনীয়া। যে কারণে রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন সন্তানের মাতা এবং গৃহকর্ত্রী।'

আবূ হুরাইরা (রা) তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দুনিয়ার সমস্ত নারীর ওপর চারজন নারীর মর্যাদা রয়েছে- মারইয়াম বিনতে ইমরান, ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মদ।' ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ মাটির ওপর চারটি রেখা এঁকে বলেন, 'জান, এটি কি? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-ই ভালো জানেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'শ্রেষ্ঠ চার জন জান্নাতী নারী-

১. খাদীজা (রা),

২. ফাতিমা (রা),

৩. মারইয়াম (রা) (ঈসা (আ)-এর মা),

৪. আছিয়া (রা) (ফেরাউনের স্ত্রী)।

সত্যি কথা বলতে কি, রাসূল ﷺ খাদীজার যত প্রশংসা করতেন অন্য কোন স্ত্রীর ব্যাপারে ততটা করতেন না।

সমগ্র আরব যখন রাসূল ﷺ-এর দুশমনে পরিণত হয় অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে, তখন একদিন নবীজীকে খুঁজতে খাদীজা (রা) বাইরে বের হন। পথে জিবরাঈল (আ) মানুষের রূপ ধরে তাঁর কাছে আসেন এবং রাসূল ﷺ-এর খোঁজ খবর নিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু খাদীজা (রা) ভয় পেয়ে যান এ ভেবে যে সম্ভবত তিনি শত্রু, রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার জন্য খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। সে কারণে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং দ্রুত গৃহে ফিরে আসেন। বিষয়টি রাসূল ﷺ-কে খুলে বললে তিনি বলেন, 'ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি

আমাকে বলে গেছেন, তোমাকে তাঁর সালাম পৌঁছাতে এবং জান্নাতে এমন গৃহের সুসংবাদ শুনাতে যে গৃহ তৈরি হয়েছে মণি-মাণিক্য দিয়ে, হৈ চৈ আর কষ্ট ক্লেশ কিছুই থাকবে না সেখানে।'

একটি বর্ণনা থেকে জানা যায়, একবার রাসূলে করীম ﷺ ফাতিমা (রা)-কে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, মা তোমার কি অবস্থা? তিনি বললেন, আমি অসুস্থ। তদুপরি ঘরে খাবার কিছু নেই। রাসূল ﷺ বললেন, কন্যা! তুমি দুনিয়ার নারীদের সরদার। এতে তুমি কি সন্তুষ্ট নও? ফাতিমা (রা) বললেন, 'বাবা! তাহলে মারইয়াম বিনতে ইমরান?' রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি তোমার যুগের নারীদের সরদার। মারইয়াম ছিল অতীতকালের নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর খাদীজা বর্তমান উম্মতের নারীদের মধ্যে উত্তম।'

রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজার মৃত্যুর পরও তাঁকে ভুলতে পারেননি। যে জন্য তাঁর মৃত্যুর পর যতবারই বাড়িতে পশু জবেহ্ হতো, ততবারই তিনি তালাশ করে করে খাদীজার বান্ধবীদের ঘরে ঘরে হাদিয়া স্বরূপ গোশত পাঠিয়ে দিতেন।

একবার রাসূল ﷺ-এর কাছে জিবরাঈল (আ) বসে আছেন, এমন সময় সেখানে খাদীজা (রা) উপস্থিত হলেন। খাদীজাকে দেখে জিবরাঈল (আ) রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'তাঁকে মণি-মুক্তার তৈরি একটি জান্নাতী মহলের সুসংবাদ দিন।'

প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা (রা) যখন প্রিয় দাস যায়িদ বিন হারিসাকে স্বামীর হাতে তুলে দিলেন তখন রাসূল ﷺ স্ত্রীকে খুশি করার জন্য যায়িদকে স্বাধীন করে দিলেন। খাদীজার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আয়েশা (রা) যখন রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসারচ্ছলে রাগাতে চেষ্টা করতেন তখন তিনি বলতেন, 'আল্লাহ্ আমার অন্তরে তাঁর (খাদীজার) জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।'

খাদীজা (রা)-এর সন্তান-সন্ততি : খাদীজা (রা)-এর গর্ভে রাসূল ﷺ-এর ৬ জন সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। ৪ জন মেয়ে ও ২ জন ছেলে। পর্যায়ক্রমে তারা হলেন–

১. কাসিম (রা)। যে কারণে রাসূল ﷺ-এর ডাক নাম ছিল আবুল কাসিম। কাসিম (রা) অল্প বয়সে মক্কায় ইনতিকাল করেন।

২. যয়নব (রা)। যার বিবাহ হয়েছিল খাদীজার ভাগিনেয় আবুল আস (রা)-এর সাথে।

৩. রুকাইয়া (রা)।

৪. উম্মু কুলসুম (রা)। রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিবাহ হয়েছিল আবু লাহাবের দুই পুত্রের সাথে। পরবর্তীতে তাদের বিবাহ ভেঙ্গে দেয়া হয়। পরে রুকাইয়াকে ওসমান (রা)-এর সাথে বিবাহ দেয়া হয়। হিজরী দ্বিতীয় সনে রুকাইয়া (রা)-এর মৃত্যু হলে রাসূল ﷺ উম্মে কুলসুমকে ওসমানের সাথে বিবাহ দেন' এ জন্য তাকে যুন নূরাইন দুই জ্যোতির অধিকারী বলা হয়।

৫. খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রা)। তার সাথে আলী (রা)-এর বিবাহ হয়।

৬. আবদুল্লাহ (রা)। যিনি নবুয়াতপ্রাপ্তির ১ বছর পর জন্মলাভ করেন। আবদুল্লাহ অল্প বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার জন্মের কারণে খাদীজা প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র কাসিম (রা)-এর শোক ভুলে যান। কিন্তু তিনিও শিশুকালেই ইন্তেকাল করেন। তারই উপাধি ছিল তায়্যিব ও তাহির। কারণ তিনি নবুয়্যাতের যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

নবুওয়্যাতের পঞ্চম বছর রজব মাসে মুসলমানদেরকে হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। তখন খাদীজা (রা)-কে এক কন্যা হতে বিচ্ছিন্ন হতে হয়। রুকাইয়া (রা) তাঁর স্বামী ওসমানের সাথে হাবশা হিজরত করেন। দীর্ঘদিন যাবত খাদীজা (রা)-কে এ বিয়োগ ব্যাথা ভোগ করতে হয়। নবুওয়্যাতের নবম ও দশম বছরের মধ্যবর্তী সময়ে তারা হাবশা (আবিসিনিয়া) হতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় ৪ বছর তিনি মাতা হতে বিচ্ছিন্ন থাকেন।

নবুওয়্যাতের অষ্টম বছর রুকাইয়ার বয়স ১৫ বছর হয় এবং তার এক বছর পর নবুওয়্যাতের নবম বছরে রুকাইয়ার গর্ভে আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূল ﷺ-এর প্রতি নির্মম অত্যাচার : হাবশায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি কাফিরগণের দুর্ব্যবহার ও অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। নবুওয়্যাতের সপ্তম বছর মহররম মাস হতে 'শিব-ই-আবি তালিব' নামক গৃহ পথে অবরুদ্ধ থাকতে হয়। কুরাইশগণ যখন দেখল যে, সাহাবায়ে কেরাম হাবশায় পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং নাজ্জাশী তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, ওমর ও হামযা ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সকল গোত্রে ইসলামের চর্চা শুরু হয়ে গেছে, তখন তারা পরামর্শ করে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব সম্পর্কে এ অঙ্গীকারনামা প্রদান করে যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ : বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব

যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ-কে হত্যার জন্য তাদের নিকট সোপর্দ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে না, ক্রয়-বিক্রয় করবে না, তাদের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখবে এবং তাদের নিকট কোন খাদ্যসামগ্রী পৌছতে দিবে না।

আবদ দার গোত্রে মনসুর ইবনে ইকরামা এ অঙ্গীকারনামা লিপিবদ্ধ করেন। এর বিষয়বস্তুর প্রতি গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে একে কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। উপায়ান্তর না দেখে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব আবু কুবাইস পর্বতের শিব-ই আবু তালিব নামক গিরিপথে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তা ছিল হাশিম গোত্রের মীরাছী (উত্তারাধিকার) সূত্রে প্রাপ্ত গিরিপথ।

আবু তালিব রাসূলের সঙ্গে ছিলেন। আবু তালিব তার পরিবারবর্গ নিয়ে পৃথক হয়ে যায় এবং কুরাইশদের সাথে যোগ দেয়। রাসূল ﷺ-এর সাথে খাদীজাও এ গিরিপথে ছিলেন। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত এ গিরিপথে অবস্থান করেন তারা। প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে সেখানে খাদ্য সামগ্রী পৌছানো হতো। খাদীজা (রা)-এর তিন ভ্রাতুষ্পুত্র কুরাইশদের সরদার হাকিম ইবনে হিজাম, আবুল বুক্কারী ও জাম'আ ইবনুল আসওয়াত অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও খাদ্য পৌছানোর এ মহান কাজে অংশগ্রহণ করেন। তাদের উষ্ট্র ভিতরে প্রবেশ করত খাদ্যসামগ্রী নিয়ে। পঞ্চাশাধিক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি অতি দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে সে পার্বত্য গিরিপথে জীবন যাপন করতে থাকেন।

একাধিকক্রমে প্রায় তিন বছর পর দুশমনদের মধ্যেই দয়ার সঞ্চার হল এবং তাদের পক্ষ হতে এ লিখিত অঙ্গীকার ভঙ্গ করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল। এ নিপীড়নমূলক অঙ্গীকার ভঙ্গের উদ্যোক্তা ছিলেন কুরাইশের পাঁচজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁরা হলেন হিশাম ইবনে 'আমার 'আমিরী', যুহাইর ইবনে আবী উমাইয়া মাখযুমী, মুত'ইম ইবনে 'আদিয়্যা, আবুল-বুখতারী ইবন হিশাম ও যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ। শেষোক্ত দুজন খাদীজা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন বনু হাশিমের নিকট-আত্মীয়। যুহাইর ছিলেন আবূ জাহলের চাচাতো ভাই এবং উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)-এর ভাই। তা ছিল নবুওয়্যাতের দশম বছরের ঘটনা।

ওফাত : নবুওয়্যাতের দশম বছরে রমযান মাসের ১০ তারিখে মক্কায় খাদীজা (রা) ইন্তেকাল করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। তখনো জানাযার

সালাতের বিধান চালু হয়নি। এ জন্য জানাযা ছাড়াই তাঁকে 'হাজুন' নামক কবরস্থানে দাফন করা হয়। 'হাজুন' মক্কার একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে এটি জান্নাতুল মাওলা বা জান্নাতুল মু'আল্লা নামে পরিচিত। নবী করীম ﷺ নিজেই খাদীজার লাশ কবরে নামান।

খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর ফাতিমা (রা) রাসূল ﷺ-এর নিকটে তাঁর মায়ের অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'তোমার মা খাদীজা (রা), সারা (রা) এবং মারইয়ামের মধ্যখানে অবস্থান করছেন।'

রাসূল ﷺ-এর পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিব খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের বছরে ইন্তেকাল করেন। অবশ্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, আবূ তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পর খাদীজা (রা) ইন্তেকাল করেন। যা হোক সময়টা ছিল রাসূল ﷺ-এর একান্ত প্রিয়জন হারানোর দুঃখজনক সময়। এজন্য মুসলিম উম্মাহর নিকট এ বছরটি 'আ'মুল হুযুন' বা শোকের বছর নামে অভিহিত হয়েছে।

২. উম্মুল মু'মিনীন সাওদা বিনতে যাম'আ (রা)

'তুমি সত্যই এ স্বপ্ন দেখে থাকলে আল্লাহর শপথ,
আমি মারা যাবো এবং নবীজী তোমাকে বিয়ে করবেন।'

সাওদা (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দ্বিতীয় স্ত্রী, উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের নেতৃস্থানীয়া। খাদীজার ইন্তেকালের পর তিনিই সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং সংসারের হাল ধরেন। রাসূল ﷺ-এর দুঃখময় জীবনকে সুখময় করে তোলেন।

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম সাওদা। পিতার নাম যাম'আ। তাঁর বংশ তালিকা এরূপ– সাওদা বিনতে যাম'আ বিন কায়েস বিন আবদে শামস বিন আবদ বিন নাসর বিন মালেক বিন হাসল বিন আমের ইবনে লুয়াই। তাঁর মাতার নাম ছিল শামুস বিনতে কায়েস বিন যায়েদ বিন আমর বিন লবিদ বিন আমের বিন গণম বিন আদী বিন আন নাজ্জার। মাতা শামুস ছিলেন মদীনার নাজ্জার বংশের মেয়ে।

জন্ম : সাওদা ৫৬৫/৫৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আরবের বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একটি প্রসিদ্ধ শাখা লুওয়াই বিন আমের গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম বিবাহ : সাওদা (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয় তাঁর পিতার চাচাত ভাই সাকরান বিন আমরের সাথে। যিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরত : ইসলামের সূচনা লগ্নেই তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আত্মীয়-স্বজনের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও ইসলাম কবুল করেন। শুধু তাই নয়, তাদের নিকটাত্মীয়দের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁরা রাসূল ﷺ-এর পরামর্শ অনুযায়ী আবিসিনিয়া হিজরত করেন। এ আবিসিনিয়াতেই

তাদের একমাত্র সন্তান আবদুর রহমান জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে আবদুর রহমান হালুলার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

প্রথম স্বামীর ইন্তেকাল : সাকরান দম্পতি আবিসিনিয়া থেকে মক্কায় ফেরার কিছুদিন পরই সাকরান ইন্তেকাল করেন। মক্কায় তাকে সমাহিত করা হয়।

রাসূলﷺ-এর সাথে বিবাহের স্বপ্ন : সাকরানের মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে সাওদা (রা) স্বপ্নে দেখেন, 'নবীﷺ আগমন করে তাঁর কাঁধে কদম (পা) মুবারক স্থাপন করেছেন।' তিনি স্বামী সাকরান (রা)-কে স্বপ্ন খুলে বললে তিনি বলেন, 'তুমি সত্যই এ স্বপ্ন দেখে থাকলে আল্লাহর শপথ, আমি মারা যাবো এবং নবীজী তোমাকে বিয়ে করবেন।' সাওদা (রা) পুনরায় স্বপ্ন দেখেন যে, 'তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন, আকাশের চাঁদ ছুটে এসে তাঁর মাথায় পড়ছে।' এ স্বপ্ন সম্পর্কেও সাকরানকে জানালে তিনি বলেন, 'আমি খুব সহসা মৃত্যুবরণ করব এবং আমার পরে তুমি বিয়ে করবে।' সাকরান (রা) সে দিনই অসুস্থ হন এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ইন্তেকাল করেন।

স্বামী সাকরানের মৃত্যুর পর শিশুপুত্র আবদুর রহমানকে নিয়ে সাওদা (রা) অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দিন যাপন করতে থাকেন। মুসলমান হওয়ার কারণে আত্মীয়-স্বজনরাও তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। এ সময়ে একান্ত অনন্যোপায় হয়ে তিনি শিশুপুত্রসহ রাসূলﷺ-এর এক দূর-সম্পর্কীয় খালা খাওলার বাড়িতে আশ্রয় নেন। খাওলার অবস্থাও অস্বচ্ছল ছিল। তবুও ধৈর্য, সংযম ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক সাওদা অভাব-অনটনের মধ্যে দিয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের চেষ্টা করে যেতে লাগলেন।

চিন্তিত রাসূলﷺ : পৃষ্ঠপোষক চাচা আবূ তালিবের মৃত্যু সর্বোপরি খাদীজার মৃত্যুতে রাসূলﷺ খুবই মনকষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করছিলেন। মা হারা মাসুম বাচ্চা উম্মু কুলছুম ও ফাতিমাকে নিয়েই বেশি চিন্তার মধ্যে ছিলেন তিনি। এমন কি ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম রাসূলﷺ-কে নিজ হাতেই সম্পাদন করতে হচ্ছিল। যা একজন পুরুষ মানুষের জন্য ছিল সত্যিই কষ্টসাধ্য। প্রকৃতপক্ষে সংসারে এ অব্যবস্থাপূর্ণ শোচনীয় পরিস্থিতিতে সন্তানদের লালন-পালনের জন্য রাসূল ﷺ-এর একজন জীবন সাথীর জরুরি প্রয়োজন ছিল। মূলত খাদীজাবিহীন নবীর সংসার জীবন অনেকটা মাঝিবিহীন নৌকার মত বেশামাল অবস্থায় পৌঁছেছিল।

সাওদার বিবাহের ব্যবস্থাপনা : রাসূল ﷺ-এর সংসারের এ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে একদিন তাঁর খালা উসমান বিন মাযউন-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম নবীগৃহে এসে দেখেন যে– রাসূল ﷺ নিজ হাতে থালা-বাসন পরিষ্কার করছেন। তখন তিনি রাসূল ﷺ-কে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেগুলো পরিষ্কার করেন এবং বিনীতভাবে রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! খাদীজার ইনতিকালে তোমাকে অত্যন্ত বিষণ্ন দেখছি।' বললেন, 'ঠিক! ব্যাপার তো তাই।' তখন খাওলা বললেন, 'হে মুহাম্মদ! বর্তমানে তোমার সংসারে একজন পরিচর্যাকারিণীর প্রয়োজন।

সুতরাং তুমি যদি অনুমতি প্রদান কর তাহলে সাওদা বিনতে যাম'আর সাথে তোমার বিয়ে দিতে পারি। সাওদা খুবই নিরীহ, অসহায় ও খুবই ভালো। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও সহিষ্ণুতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি, এতে তাঁর মতো একজন রমণী তোমার গৃহে আসলে তোমার কষ্ট অনেকাংশে লাঘব হবে। সাওদা তোমার সংসারকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।' নবী করীম ﷺ এ প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং ঐ দিনই খাওলা সাওদাকে সুসংবাদ শুনান। সাওদা তা কবুল করলে খাওলা সাওদার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করলেন। সাওদার মা খ্রিস্টান ছিলেন তবুও তিনি বললেন, 'কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষের সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে আমি রাজি আছি।'

রাসূল ﷺ-এর সাথে সাওদার বিয়ে : সাওদা ও তাঁর পিতা বিয়েতে রাজি হওয়ায় রাসূল ﷺ নিজে সাওদার পিতার বাড়িতে উপস্থিত হলেন। চারশত দিরহাম মোহরানা ধার্য করে সাওদার পিতা নিজে খুতবা প্রদান করে বিয়ে পড়ান। কিন্তু সাওদার ভাই আবদুল্লাহ এ বিয়ের খবর জানার পর প্রচণ্ড অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন, এমন কি নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে মাথা ও কপালে ধূলাবালি মাখিয়ে বলেছিলেন, 'হায় কি সর্বনাশ হলোরে? পরে যখন তিনি ইসলাম কবুল করেন তখন তার এ জঘন্য উক্তির জন্য সব সময় আফসোস করতেন।

বিয়ের পর পরই সাওদা রাসূল ﷺ-এর সংসারে চলে আসেন এবং বাচ্চাদের লালন-পালনসহ গৃহের সব দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। ফলে রাসূল ﷺ যে অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশ করেন।

রাসূল ﷺ ও সাওদার যখন বিয়ে হয় তখন রাসূল ﷺ-এর বয়স ৫০ বছর আর সাওদা (রা)-এর বয়স ৫০/৫৫ বছর। হিযরতের প্রায় তিন বছর পূর্বে সাওদা মহানবী ﷺ-এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। নবুওয়্যাতের দশম বছর রমযান মাস হতে শুরু করে একাদশ হিজরীর রবিউল আওয়াল পর্যন্ত আনুমানিক সাড়ে বারো বছর পর্যন্ত তিনি নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র সাহচর্য লাভ করেন। জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে নবুওয়্যাতের দশম বছরের রমযান হতে ১ম হিজরীর শাওয়াল পর্যন্ত তিনি এককভাবে নবী পরিবারের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।

অত:পর ক্রমান্বয়ে মহানবী ﷺ-এর অপরাপর জীবন-সঙ্গিনীগণ আগমন করতে থাকেন এবং সাওদা (রা)-এর দায়িত্বও হ্রাস পেতে থাকে। হিজরতের ১ম/২য় বছর রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করেন। এ সময় আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ৬/৭/৮/৯ বছর। আয়েশা (রা) বিয়ের ৩ অথবা ৪ বছর পর রাসূল ﷺ-এর সংসারে আসেন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ-এর সাথে তার বাসর হয়েছিল ৯/১০/১১/১২/১৩ বছরের সময়। এ অসম বয়সের বিয়ের ব্যাপারে অর্থাৎ বৃদ্ধা ও শিশুকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইসলাম বিরোধী ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ সমালোচনামুখর হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু রাসূল ﷺ ছিলেন মানবতার বন্ধু। ইচ্ছে করলে তিনি খাদীজার মৃত্যুর পরও আরবের সেরা সুন্দরী যুবতীদের যে কাউকে বিয়ে করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি সম্পূর্ণ বৃদ্ধা, বিধবা ও মোটা একজন মহিলাকে বিয়ে করলেন। কারণ সাওদা ছিলেন একজন অসহায় বিধবা। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর আত্মীয়-স্বজন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। রাসূল ﷺ এ সহায়হীন মুসলিম মহিলার কল্যাণের চিন্তা করেই তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। অপরদিকে তাঁর শিশু কন্যা উম্মু কুলছুম ও ফাতিমা'র কথা চিন্তা করেও তিনি বৃদ্ধা সাওদাকে ঘরে তুলে নেন।

কিশোরী আয়েশাকে রাসূল ﷺ-এর বিয়ে করার ব্যাপারে কথা হচ্ছে– জাহেলী যুগে আরবে প্রচলিত ছিল আরবরা কথিত ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে কোনো বিয়ের সম্পর্ক করত না। রাসূল ﷺ ও আয়েশা (রা)-এর বিয়ে সে কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত হানলো। তাছাড়া এ বিয়েটা হয়েছিল মূলত আল্লাহরই নির্দেশে।

আকৃতি : সাওদা (রা) ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী। তাঁর দৈহিক গঠন ছিল চমৎকার। তবে তিনি একটু মোটা ধরনের ছিলেন, যে কারণে দ্রুত চলাফেরা করতে কষ্ট হতো। তিনি ছিলেন বুদ্ধিমতি ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্না।

পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়া : তিনি বিদায় হজ্জের সময় মুজদালিফা থেকে রওয়ানা হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রওয়ানা হতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহানবী ﷺ তা অনুমোদন করেননি। শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ-এর সাথেই তাঁকে রওয়ানা হতে হয়। একদিন প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য ভোররাতে খোলা মাঠের দিকে (তখনো পর্দার আয়াত নাযিল হয়নি) সাওদা গমন করেন। ফেরার পথে ওমর (রা) তাকে চিনে ফেলেন। ওমর (রা) তাঁকে তখন বলেন, 'আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি।' বিষয়টি সাওদা (রা) ও ওমর (রা) কেউই পছন্দ করেননি। যে কারণে বিষয়টি নিয়ে তাঁরা রাসূল ﷺ-এর সাথে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করেন। এর পর পরই পর্দার আয়াত নাযিল হয়।

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ۥ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ۔

অর্থ: আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না। তোমরা সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে। হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো কেবল চাহেন তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। [সূরা—৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৩]

রাসূলের নির্দেশ পালন : রাসূল ﷺ বিদায় হজ্জের পর তার পবিত্র স্ত্রীদেরকে বলেন, 'অতঃপর আর ঘরের বাইরে যাবে না।' আবূ হুরাইরা (রা) থেকে জানা যায় নবী ﷺ-এর ওফাতের পরও অন্যান্য স্ত্রীরা হজ্জ করেন। কিন্তু সাওদা বিনতে যাম'আ ও যয়নব বিনতে জাহাশ এ নির্দেশটি এমন কঠোরভাবে মেনে চলেন যে আর ঘরের বাইরে যাননি। তিনি বলতেন, 'আমি হজ্জ করেছি, ওমরাহ করেছি। এখন আল্লাহর নির্দেশ মতো ঘরে বসে কাটাবো।'

রাসূলকে খাদীজার মতো আশ্রয় দান : সাওদা (রা) যখন রাসূল ﷺ-এর ঘরণী হয়ে আসেন তখন তাঁর ওপর শত্রুদের পক্ষ থেকে নানা ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন নেমে এসেছিল। সাওদা স্বামীর এ দুঃখ-কষ্ট ও মর্মযাতনার বিষয় উপলব্ধি করে সর্বদা তাঁর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করতেন। খাদীজার মতই

সাওদা তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে স্বামীর সংকটকালের মোকাবিলা করেছেন। নিঃসন্দেহে সাওদা (রা) এসব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠস্থানীয়া ছিলেন।

সৎ সন্তানকে মায়ের মতো সোহাগদান : সাওদা (রা) নবী নন্দিনী উম্মু কুলছুম ও ফাতিমাকে এমনভাবে লালন-পালন করেন যে, তাঁরা কোন দিনই তাদের মায়ের অভাব অনুভব করেননি। তিনি কুলছুম ও ফাতেমাকে খুবই আদর করতেন।

জীবনচরিত : স্বল্প ভাষিণী, মধুর আচরণকারিণী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্না পবিত্র প্রাণা নারী ছিলেন সাওদা (রা)। অতিথিপরায়ণতা ও দানশীলতার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

একবার ওমর (রা) উপহারস্বরূপ একটি থলে ভর্তি দিরহাম সাওদা (রা)-এর নিকট পাঠালেন। সাওদা (রা) থলে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর ভিতরে কি আছে? বলা হল, 'দিরহাম।' এ কথা শুনে সাওদা (রা) বললেন, 'খেজুরের থলেতে কি দিরহাম শোভা পায়?' এ বলে তিনি সমস্ত দিরহাম গরীব মিসকীনের মধ্যে বিলি করে দিলেন।

সাওদা (রা) ছিলেন বেশ রসিক মহিলা। মাঝে মাঝে তিনি এমন এমন রসিকতাপূর্ণ কথা বলতেন যে, রাসূল ﷺ ও হেসে ফেলতেন। একবার তিনি রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কাল রাতে আমি আপনার সাথে সালাত পড়ছিলাম। আপনি রুকুতে এত দেরী করছিলেন যে, আমার সন্দেহ হয়েছিল নাক ফেটে রক্ত ঝরবে। এ কারণে আমি আমার নাক অনেকক্ষণ টিপে ধরেছিলাম।' রাসূল ﷺ এ কথা শুনে মুচকি হাসলেন।

সাওদা (রা) সে উদার মহিলা যিনি সপত্নী আয়েশার জন্য ছাড় দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ-এর খেদমতে বলেছিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমার জন্য যে রাত আপনার সান্নিধ্যে থাকা বরাদ্দ আছে, সে রাতটুকু আমি আয়েশাকে দান করলাম। সে কুমারী, আল্লাহ আপনার সান্নিধ্য ও সাহচর্য দ্বারা তাকে অধিক উপকৃত করুন, এটাই আমার কামনা।' রাসূল ﷺ ও শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন, 'সাওদা! প্রকৃতই তুমি অনন্যা। প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ হিজরী সনে আয়েশা (রা) স্বামী গৃহে আসলে সাওদা (রা) তাঁকে অত্যন্ত আপন করে নেন। গার্হ্যস্থ জীবনের অধিকাংশ বিষয়ে সাওদা (রা) ছিলেন আয়েশা (রা)-এর বান্ধবী।

তিনি আয়েশা (রা)-কে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। রাসূল ﷺ-এর ঘরে আসার পর সাওদা (রা) নিজেই আয়েশার সকল সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন। এ জন্যই আয়েশা (রা) তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'আমি কেবল একজন মহিলার কথাই জানি, যার অন্তরে হিংসার ছোঁয়া মোটেই পড়েনি। তিনি হলেন সাওদা। কতইনা ভালো হতো যদি আমার অন্তর তার দেহে স্থান লাভ করত।'

কতখানি উদার ও মহৎ হৃদয়ের মানুষ হলে এটা সম্ভব? সম্ভবত সাওদা (রা) বলেই তা সম্ভব হয়েছিল।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ (رضى) وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ۔

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সওদা বিনতে যাম'আ (রা) তাঁর কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাত যাপনের পালা আয়েশা (রা)-কে দিয়ে দেন। সুতরাং রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)-এর জন্য (দু'দিন বরাদ্দ করেন), একদিন তার নিজের অন্যদিন সাওদার (রা)। (বুখারী)

রাসূল ﷺ-এর ঔরসে সাওদা (রা)-এর গর্ভে কোন সন্তান জন্ম লাভ করেনি। প্রথম স্বামী সাকরাণের ঔরসে আবদুর রহমান নামে একজন পুত্র সন্তান ছিলেন। যাঁর কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীসশাস্ত্র শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে সাওদা (রা) অনন্য অবদান রেখেছেন। তিনি সর্বমোট ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে বুখারী শরীফে একটি হাদীস উল্লেখ আছে। আবদুল্লাহ বিন আব্বাস, ইয়াহইয়া বিন আবদুর রহমান বিন আস, আদ বিন জাররার মত বিখ্যাত সাহাবীরা তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত তাঁর হাদীসটি হল–

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضى) عَنْ سَوْدَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : مَاتَتْ لَنَا شَاةٌ فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا ثُمَّ مَازَلْنَا نَنْبِذُ فِيهِ حَتّٰى صَارَ شَنًّا ۔

ইবনে আব্বাস (রা) উম্মুল মু'মিনীন সাওদা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমাদের একটি বকরী মারা গেলে আমরা এর চামড়া পরিশোধন

(দাবাগাত) করলাম। এরপর আমরা তাতে পানি ঢেলে খেজুর রাখতে লাগলাম। এমনকি তা একটি বিশেষ চর্ম থলেতে পরিণত হলো।

এ ছাড়া তাঁর থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসের মধ্যে রয়েছে-তিনি বলেন : জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ করার শক্তি তাঁর নেই। নবী করীম ﷺ বললেন : তোমার পিতার ওপর যদি ঋণ থাকে, আর তা যদি তুমি আদায় করে দাও, তবে কি তা তোমার থেকে গ্রহণ করা হবে? সে বলল : হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : আল্লাহ অধিক দয়ালু, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর।

সাওদা বিনত যাম'আ (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললাম, আবু যাম'আ তাঁর এক দাসীর সন্তান (উম্মু ওয়ালাদ) রেখে মারা গিয়েছে। ভূমিষ্ঠ সন্তান আমাদের ধারণাকৃত লোকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতঃপর নবী করীম ﷺ তাকে বললেন : তুমি তার থেকে পর্দা কর। সে তোমার ভাই এর থেকে নয়। আর তার উত্তরাধিকার থাকবে।

ওফাত : রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর প্রায় এগার বছর জীবিত ছিলেন এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আপন ভূমিকা পালন করেন। ৭৫ বছর বয়সে সাওদা (রা) ইন্তেকাল করেন। মদীনার জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যু সন নিয়ে মতভেদ আছে। ওয়াকিদীর মতে আমির মু'আবিয়ার শাসনামলে ৫৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। আর ইবনে হাজারের মতে ৫৫ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম বুখারী (র) বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ওমর (রা)-এর খেলাফতের সময় ২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

৩. উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)

এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, 'এক ফিরিশতা কারুকার্য খচিত একটি রুমাল জড়িয়ে অতি মনোরম এক বস্তু তাঁকে উপহার দিচ্ছেন। রাসূল ﷺ তা হাতে নিয়ে ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কি জিনিস? উত্তরে ফেরেশতা তা খুলে দেখার জন্য বললেন। রাসূল ﷺ খুলে দেখলেন তার মধ্যে আয়েশার ছবি অঙ্কিত রয়েছে।'

আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

١. عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ تَكُوْنِيْ زَوْجَتِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَاَنْتِ زَوْجَتِيْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী হবে? আয়েশা বলল, কেন নয়? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার স্ত্রী।

(হাকিম : সিলসিলা আহাদিস সহীহা লি আলবানী, হাদীস নং-১১৪২)

নাম ও বংশ : নাম আয়েশা। আয়েশা শব্দের অর্থ সৎচরিত্রা। ডাক নাম উম্মে আবদুল্লাহ। উপাধি সিদ্দিকা ও হুমায়রা। তিনি খুব ফর্সা ছিলেন এজন্য তাকে হুমায়রা বলা হতো। পরবর্তীকালে নবী ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার কারণে উম্মুল মু'মিনীন বা মু'মিনদের মা খেতাব প্রাপ্ত হন।

পিতা-মাতা ও বংশ পরিচয় : পিতার নাম আবূ বকর সিদ্দিক (রা)। যিনি রাসূল ﷺ-এর সার্বক্ষণিক সহচর ও বন্ধু ছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম খলিফা ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল যয়নব এবং ডাক নাম ছিল উম্মে রুম্মান।

পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ তালিকা হল, আয়েশা বিনতে আবূ বকর ইবনে কুহাফা ইবনে ওসমান ইবনে আমের ইবনে ওমর ইবনে কা'ব ইবনে সা'দ ইবনে তাইম। মাতার দিক থেকে আয়েশা বিনতে উম্মে রুম্মান বিনতে আমের পিতৃকূলের দিক থেকে আয়েশা (রা) তাইম গোত্রের এবং মাতৃকূলে দিক থেকে কেনানা গোত্রের ছিলেন।

কুনিয়াত বা উপনাম : আয়েশা (রা) নিঃসন্তান ছিলেন। একদিন তিনি রাসূল ﷺ-কে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার অন্যান্য স্ত্রীগণ তাদের পূর্বোক্ত স্বামীর সন্তানদের নামানুসারে গুণবাচক নাম গ্রহণ করে থাকেন। আমি কি ডাক নাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কারো নামের সাথে নিজের নামকে সংযুক্ত করবো?' রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃদু হাসলেন এবং বললেন, 'আয়েশা! তুমি তোমার বোনের ছেলে আবদুল্লাহর নামের সঙ্গে সংযুক্ত করে ডাকনাম (কুনিয়াত) গ্রহণ কর।' এর পর থেকে তিনি উম্মে আবদুল্লাহ নামেই পরিচিতি লাভ করেন। অবশ্য তাঁর পিতা আবূ বকর (রা)-এর আসল নাম ছিল আবদুল্লাহ, আর ডাক নাম ছিল আবূ বকর। এ জন্য আয়েশা (রা)-কে উম্মে আবদুল্লাহ অর্থাৎ আবদুল্লাহর মা বলার কারণ ইবনুল আসীর এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ তাঁকে 'সত্যবাদীর কন্যা সত্যবাদীণী' বলে ডাকতেন।

জন্ম : আয়েশা (রা)-এর জন্ম ও বিয়ের সন তারিখ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। তবুও মতগুলো নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নবুওয়্যাতের ২/৩ সনে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং নবুওয়্যাতের ১০ম সনের শাওয়াল মাসে বিয়ে হয়েছিল। এ সময় তার বয়স হয়েছিল ৬/৭ বছর। হিজরী দ্বিতীয় সনের শাওয়াল মাসে রাসূল ﷺ ও আয়েশা (রা)-এর বাসর অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে আয়েশার বয়স হয়েছিল ৯/১০/১১ বছর, আর নবী নন্দিনী ফাতিমার বয়স হয়েছিল ১৭/১৮ বছর। আয়েশা (রা) ফাতিমা (রা) থেকে ৫ বছরের ছোট ছিলেন।

রাসূলের সাথে আয়েশার বিয়ের প্রস্তাব : রাসূল ﷺ-এর খালা খাওলা বিনতে হাকিম ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও আরবের জাহেলী যুগের কুসংস্কার দূর করার জন্য আয়েশা (রা)-কে বিয়ে করার ব্যাপারে তাঁকে বললেন, তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ এ বিষয়ে হ্যাঁ বা না কিছুই বললেন না। তিনি আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর তিনি এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, 'এক ফেরেশতা কারুকার্য

খঁচিত একটি রুমাল জড়িয়ে অতি মনোরম এক বস্তু তাঁকে উপহার দিচ্ছেন। রাসূল ﷺ তা হাতে নিয়ে ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এটি কি জিনিস? উত্তরে ফেরেশতা তা খুলে দেখার জন্য বললেন। রাসূল ﷺ খুলে দেখলেন তার মধ্যে আয়েশার ছবি অঙ্কিত রয়েছে।'

এরপর রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে খাওলা আয়েশা (রা)-এর পিতা-মাতার নিকট প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাব শুনে আবূ বকর জানান যে, এ বিয়েতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে বলেন, 'এ বিয়ে কীভাবে বৈধ হবে? আয়েশা তো রাসূলুল্লাহর ভাইঝি।' এ কথা শুনে রাসূল ﷺ বলেন, 'তিনি তো কেবলমাত্র আমার দ্বীনি ভাই।' খাওলা আবূ বকর (রা)-কে বোঝান যে, রাসূল ﷺ তো আপনার রক্ত সম্পর্কের ভাই নন। রক্ত সম্পর্কে না থাকলে একই খান্দানে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের মেয়েকে পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে।

আয়েশা (রা)-এর মা এ বিষয়ে বললেন, 'আয়েশার সাথে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিয়ে খুবই আনন্দের কথা। আমার বিশ্বাস এ বিয়ের ফলে আরবের অনেক জঘন্য কু-প্রথা দূর হবে।'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হলে আবূ বকর (রা) তাঁর পিতা আবূ কুহাফাকে বিষয়টি বললেন। তিনি তাঁর মতামতে বললেন, 'রাসূলুল্লাহর সাথে আমার নাতনীর বিয়ে হলে তা বড়ই গৌরবের কথা হবে। আমার আদরের নাতনী মাহবুব রাব্বুল মাশরিকাইন ও মাগরিবাইন এর মাহবুবা হবে। তবে আমি আমার নাতনীর বিয়ে যুবায়ের ইবনে মাতয়াম এর ছেলের সাথে দেবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি। এ কথা আমি কারো নিকট এতদিন প্রকাশ করিনি। আমি যুবায়েরের মতামত নিয়ে তোমাকে আমার অভিমত জানাবো।

যুবায়ের ও তার পরিবার তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। সে কারণে তারা নওমুসলিম আবূ বকরের কন্যার সাথে তাদের সন্তানের বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রাসূল ﷺ-এর সাথে আয়েশা (রা)-এর বিয়ের বাধা দূরীভূত হয়।

বিয়ে সম্পন্ন : উভয়পক্ষ বিয়েতে সম্মত হয়ে ৫০০ দিরহাম মহরানা ধার্য করা হয়। এরপর আবূ বকর (রা) নিজে রাসূল ﷺ-এর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নিজ বাড়িতে আনলেন। রাসূল ﷺ আবূ বকরের বাড়িতে আসার সাথে সাথে উপস্থিত মেহমানবৃন্দ 'মারহাবান মারহাবান, আহলান ওয়া সাহলান' অর্থাৎ

শুভেচ্ছা স্বাগতম বলে তাঁকে খোশ আমদেদ (স্বাগতম) জানালেন। বিয়ের মজলিসে সকলকে উদ্দেশ্য করে আবূ বকর সিদ্দিক (রা) একটি বক্তৃতা দিলেন, তিনি বললেন–

'আপনারা জানেন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পয়গম্বর। তিনি আমাদেরকে আঁধার থেকে আলোকে নিয়ে এসেছেন। এ আলোকের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখবার এবং চিরদিনের জন্য আমাদের এ অকৃত্রিম বন্ধুত্ব বজায় রাখবার পথ অনেকদিন ধরে খুঁজছি। তাই আজ আপনাদের খেদমতে আমার ছোট মেয়েটিকে এনেছি। এ ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে কতশত কুসংস্কার আমরা গড়ে তুলেছি। বিনা অজুহাতে আমরা শিশু কন্যাকে মাটিতে পুঁতে ফেলি, হাত পা বেঁধে দেব-দেবীর পায়ে বলি দেই; যাদেরকে বাঁচিয়ে রাখি তাদেরকে জীবন্ত-মরা করে ফেলি, দোস্তের মেয়েকে আমাদের কেউই বিয়ে করতে পারে না। আপনারা যদি আমার এ আয়েশাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে সোপর্দ করে দেন তবে চিরতরে আরব দেশ থেকে এ সকল কুসংস্কার মুছে ফেলতে পারবেন। এতে আপনারা আমার বন্ধুত্বকে বজায় রাখতে পারবেন এবং আমার প্রিয় কন্যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থেকে ভবিষ্যতে তাঁর আদর্শ ও বাণী জগতে প্রচার করতে পারবে।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ এ বক্তৃতা শোনার পর সমবেত কণ্ঠে আবার বলে উঠলেন, 'মারহাবান, মারহাবান, (স্বাগতম) আয়েশার বিয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই কল্যাণ নেমে আসুক।'

এরপর আবূ বকর (রা) নিজে খুতবা পাঠ করে রাসূল ﷺ ও আয়েশার (রা) বিয়ে পড়িয়ে দেন।

আয়েশা (রা)-এর জন্ম ও বিয়ে ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও একটি বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকই একমত, তা হল– তিনি শাওয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেন, শাওয়াল মাসেই তাঁর বিয়ে হয় এবং শাওয়াল মাসেই তিনি স্বামীগৃহে প্রথম পদার্পণ করেন।

আয়েশা (রা)-এর জ্ঞান-গরিমা : বাল্যকাল থেকেই আয়েশা (রা) নানা ক্ষেত্রে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন। তিনি ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাধর একজন বালিকা। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। যে কোনো বিষয় তিনি দু'একবার পড়লেই মুখস্থ করে ফেলতে পারতেন। আয়েশা (রা) তাঁর পিতার সাথে থেকে

৩/৪ হাজার কবিতা ও কাসিদা কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই পিতা আবূ বকর (রা)-এর ন্যায় একজন ন্যায়পরায়ণ মানুষের পূত-পবিত্র সাহচর্য থেকে আদব-কায়দা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, দান-খয়রাত, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অতিথি আপ্যায়ন এবং সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে তাঁকেই আদর্শ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট থেকে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন, রাসূল ﷺ-এর সাহচর্যে এসে তা শতধারায় বিকশিত হয়েছিল। ফলশ্রুতিতে পরবর্তী জীবনে তিনি মুসলিম বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেমা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

কাফেরদের অন্তর্জ্বালা : ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই মক্কা ও মদীনাতে মুনাফিকরা তৎপর ছিল এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসার দেখে তাদের অন্তর্জ্বালা ক্রমেই বাড়ছিল। তারা সুযোগ খুঁজছিল বড় ধরনের কোনো গোলযোগ সৃষ্টির জন্য। বিশেষ করে রাসূল ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল এটাকে তারা ভেঙে দেয়ার ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। তাদের ধারণা ছিল আবূ বকর (রা) যেহেতু সমাজের প্রভাবশালী মানুষ, তাছাড়া রাসূল ﷺ -এর সব কিছুকে বিনা বাক্য ব্যয়ে বিশ্বাস করে। অতএব তাদের বন্ধুত্বে ভাঙন ধরানো একান্ত জরুরি।

কাফেরদের ষড়যন্ত্র : কাফেরদের অন্তর্জ্বালা ও গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য মুনাফিকদের সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই পুণ্যবতী, সতীসাধ্বী আয়েশা (রা)-এর চরিত্রের ভয়ানক এক অপবাদ রটনা করে। ইসলামের ইতিহাসে যা ইফকের ঘটনা নামে খ্যাত।

আয়েশা (রা)-এর জীবনের সাথে জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

আয়েশা (রা)-এর জীবনে চারটি ঘটনা অত্যন্ত আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ। এ ঘটনা চারটি হলো : ১. ইফক, ২. ঈলা, ৩. তাহ্‌রীম ও ৪. তাখাইয়ির।

১. ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনা

৫ম মতান্তরে ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বনূ মুসতালিক বা আল মুরায়সী যুদ্ধে যাত্রা করেন। এ যুদ্ধে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)ও শরীক ছিলেন।

অনেক মুনাফিক বা কপট মুসলমান এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধাভিযানেই মুনাফিকরা আয়েশা (রা)-এর চারিত্রিক নিষ্কলুষতাকে কেন্দ্র করে এক ষড়যন্ত্র পাকায়। তারা আয়েশা (রা)-এর পূত পবিত্র চরিত্রের ওপর নেহায়েত আপত্তিকর মিথ্যা দোষারোপ করে বসে। মূল ঘটনাটি আয়েশা (রা)-এর ভাষ্যে বিভিন্ন হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

আয়েশা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল দূরে কোথাও সফরে গেলে কুরআ বা লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিতা তাঁর কোন এক পত্নীকে সফর সঙ্গী করতেন। বনূ মুসতালিক যুদ্ধে আমি সফর সঙ্গী নির্বাচিতা হই। এটা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরের ঘটনা। পর্দা রক্ষার জন্য আমাকে হাওদাসহ উটের পিঠে উঠানো-নামানো হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে রাতে মদীনার নিকটস্থ কোন এক স্থানে তাঁবু গেড়ে অবস্থান করেন।

রাতের শেষাংশে যাত্রা শুরু করার নির্দেশ আসে। আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য বাইরে যাই। প্রয়োজন সেরে সাওয়ারীর কাছে ফিরে এসে বুকে হাত দিয়ে দেখি, আমার গলার হার হারিয়ে গিয়েছে। আবার ফিরে গিয়ে তা খুঁজতে শুরু করি। এতে বেশ দেরী হয়ে যায়। আমি হাওদার (অর্থাৎ পালকির মতো) মধ্যে আছি ভেবে লোকেরা সাওয়ারীর পিঠে হাওদা উঠিয়ে দেয়। তারা মনে করেছিল আমি হাওদার মধ্যে আছি, যেহেতু আমি চিকন ও হালকা ছিলাম সেহেতু তারা তা বুঝতে পারেনি। ঐ সময়ে খাদ্যাভাবের কারণে আমরা মেয়েরা ছিলাম খুবই হালকা-পাতলা।

সৈন্যবাহিনী রওয়ানা হওয়ার পর আমি হার খুঁজে পেলাম এবং ফিরে এসে দেখি সেখানে কেউ নেই। মনে করলাম তাঁরা আমাকে দেখতে না পেলে অবশ্যই আমার সন্ধানে ফিরে আসবে। কাজেই যে স্থানে আমি ছিলাম সেখানে গিয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে পড়লাম এবং ঘুমিয়ে পড়লাম। বনু সালাম গোত্রের যাকওয়ান শাখার সাফওয়ান ইবনে মু'আত্তাল পিছনে ছিলেন। প্রত্যুষে তিনি আমার অবস্থান স্থলের নিকট পৌঁছে নিদ্রাবস্থায় দেখে আমায় চিনে ফেলেন এবং ইন্নালিল্লাহ পড়লেন। তাঁর আওয়াজ শুনে আমি জেগে উঠলাম এবং চাদর টেনে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর শপথ। আমাদের মধ্যে কোন কথাবার্তাই হয়নি।

তিনি সাওয়ারী থেকে অবতরণ করলেন এবং সাওয়ারীকে বসিয়ে তার পা কষে বাঁধলে আমি তাতে আরোহণ করলাম। তিনি লাগাম ধরে হেটে চললেন। প্রায় দুপুরের সময় আমরা কাফেলাকে ধরলাম। তখন তাঁরা বিশ্রামের জন্য একটি স্থানে কেবলমাত্র থেমেছেন। আমি যে পিছনে রয়ে গেছি এ কথা তাঁদের কারো এখনো জানা হয়নি। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমার ওপর মিথ্যা অপবাদ রটানো হলো। মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল এ অপপ্রচারের অগ্রনায়ক। এছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে হাসান ইবনে সাবিত, মিসতাহ, ইবনে উসামাহ এবং হামনা বিনত জাহাশও এতে জড়িয়ে পড়েন।

আয়েশা (রা) বলেন : মদীনায় পৌছে আমি এক মাস যাবৎ অসুস্থ ছিলাম। এদিকে অপবাদের বিষয় নিয়ে লোকজনের মধ্যে কানা-ঘুষা হতে লাগল। কিন্তু এ সবের আমি কিছুই জানতাম না। তবে আমার সন্দেহ হচ্ছিল এবং তা দৃঢ় হচ্ছিল এ কারণে যে, আমার অসুস্থতার সময় পূর্বে রাসূল ﷺ যেভাবে আমার দেখাশুনা করতেন এবার তা করছেন না। বরং এবার "আমি কেমন আছি"? জিজ্ঞেস করেই চলে যেতেন। এতে আমার মনে বড় সংশয় সৃষ্টি হলো। ভাবতাম হয়তো কিছু একটা ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুমতি সাপেক্ষে মায়ের নিকট চলে গেলাম। যাতে তিনি আমার সেবা-শুশ্রূষা ভালোভাবে করতে পারেন।

একদা রাতের বেলায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হলাম। তখন আমরা সাধারণ আরববাসীদের অভ্যাসমত পায়খানার জন্য এলাকার বাইরে মাঠে বা ঝোপ-ঝাড়ে চলে যেতাম। 'উম্মু মিসতাহ্' ঐ রাতে আমার সাথে গিয়েছিল। কাজ সেরে ফেরার পথে উম্মু মিসতাহ্ পায়ে কাপড় জড়িয়ে পড়ে গিয়ে বলে উঠলেন, মিসতাহ্ ধ্বংস হোক। আমি বললাম, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নিজ পুত্রের ব্যাপারে একি বলছ? সে বলল মিসতাহ তোমার সম্পর্কে কী বলে বেড়াচ্ছে, তাতো তুমি শোননি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে আমার সম্পর্কে কি বলছে? তখন তিনি অপবাদ রটনাকারীদের কার্যকলাপ ও প্রচারণা সম্পর্কে আমায় অবহিত করলেন। এ ঘটনা শুনে আমার রক্ত যেন শুকিয়ে গেল। সোজা ঘরে ফিরে এসে সারারাত কেঁদে কেঁদে কাটালাম।

উম্মু মিসতাহ্ হলেন আবূ রুহ্‌ম ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে আবদ মানাফের কন্যা। তার মা ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর খালা সাখার ইবনে আমরের কন্যা। তার পুত্র মিসতাহর পিতা ছিলেন আসাসা ইবনে আদ ইবনুল মুত্তালিব।

এ দিকে ওহী আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পত্নী বিচ্ছেদের ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে আলী ইবনে আবু তালিব এবং উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-কে ডেকে পাঠালেন। উসামা আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ আপনার স্ত্রী (আয়েশা) সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া অন্য কিছু জানি না। আপনি তাঁকে নিজের কাছেই রাখুন। আলী (রা) বললেন, হে নবী! আল্লাহ তো আপনার সংকীর্ণতা রাখেননি। তিনি ছাড়া তো আরো বহু মেয়ে সমাজে আছে। তবে আপনি দাসী বারীরাকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সে আপনাকে সত্য কথাই বলবে।

নবী ﷺ বারীরাকে ডেকে বললেন, তুমি কি আয়েশার মধ্যে সন্দেহজনক কিছু দেখেছ? বারীরা বলল, সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি তাঁর মাঝে খারাপ বা আপত্তিকর কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে তিনি অল্প বয়স্ক কিশোরী হওয়ার কারণে শুধু এতটুকু দোষ দেখেছি যে, রুটি তৈরি করার জন্য আটা খামীর করে রেখে তিনি মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন, আর বকরী এসে তা খেয়ে ফেলতো।

সে দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, হে সাহাবীগণ! তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে আমার স্ত্রীর ওপর মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আমায় যে কষ্ট দিয়েছে তার আক্রমণ থেকে আমায় রক্ষা করতে পারে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রীদের মধ্যে কোন দোষ দেখতে পাইনি। একথা শুনে উসাইদ ইবনে হুদাইর মতান্তরে সা'দ ইবনে মু'আয (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! অভিযোগকারী যদি আমাদের বংশের লোক হয়ে থাকে, তবে আমরা তাকে হত্যা করবো আর আমাদের ভ্রাতা খাযরাজ গোত্রের লোক হলে আপনি যা বলবেন তাই করবো।

এ কথা শুনেই খাযরাজ গোত্র নেতা সা'দ ইবনে উবাদা দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো, কিছুতেই তাকে তুমি মারতে পারবে না। সে খাযরাজ গোত্রভুক্ত বলেই তুমি তাকে হত্যা করার কথা বলছো। সে তোমাদের গোত্রের হলে কখনই তাকে হত্যা করার কথা বলতে না। উত্তরে তাকে বলা হলো, তুমি তো মুনাফিক, এ জন্য মুনাফিকদের সমর্থন দিচ্ছ।

এরূপ কথা কাটাকাটির দরুণ মসজিদে নববীতে গোলযোগের সৃষ্টি হলো। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা মসজিদের মধ্যে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়ার উপক্রম

হয়েছিল। কিন্তু নবী ﷺ তাদেরকে বুঝিয়ে শান্ত করেন। একমাস ব্যাপী এ মিথ্যা দোষারোপের কথা সমাজে পর্যালোচনার বস্তুতে পরিণত হলো। রাসূল ﷺ মানসিকভাবে অত্যন্ত ক্ষত-বিক্ষত হলেন।

আমি অবিরাম কাঁদতে লাগলাম। আমার পিতা-মাতাও খুব উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে কালাতিপাত করছিলেন। শেষে নবী করীম ﷺ একদিন আমার পাশে এসে বসলেন। আমার পিতা-মাতা ভাবলেন, আজ হয়ত কোন সিদ্ধান্তমূলক রায় হয়ে যাবে। এ কারণে তাঁরাও কাছে এসে বসলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আয়েশা (রা)! তোমার সম্পর্কে উত্থাপিত অপবাদ-অভিযোগ আমার কানে পৌঁছেছে। তুমি যদি নির্দোষী হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ্ তোমার নির্দোষিতা প্রকাশ ও প্রমাণ করে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুনাহে লিপ্ত হয়ে থাক, তবে আল্লাহ্‌র নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাও, অপরাধী যখন অপরাধ স্বীকার করে তাওবা করে, আল্লাহ্ তখন ক্ষমা করে দেন।

এ কথা শুনে, আমি হত-বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। বাবা-মাকে বললাম, আপনারা রাসূলের কথার উত্তর দিন। তাঁরা বললেন, কি বলে যে উত্তর দিব তা আমাদের বুঝে আসছে না। তখন আমি বললাম, আপনাদের কানে একটা কথা এসে তা বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এখন যদি আমি নির্দোষ বলে প্রলাপ করি তবে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি শুধু শুধুই এমন একটি অন্যায় কর্মকে স্বীকার করে নেই, যার সাথে আদৌ আমার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই, আল্লাহ্ জানেন যে, আমি নির্দোষ তবে আপনারাও তা সত্য বলে মেনে নিবেন। আমি তখন ইয়াকূব (আ)-এর নামটি স্মরণের চেষ্টা করলাম, কিন্তু তা স্মৃতিতে এলো না। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম, এ পর্যায়ে আমি ঐ কথাই বলব, যা ইউসুফ (আ)-এর পিতা বলেছেন। তা হলো :

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَّاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ ـ

অর্থ: "এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম পন্থা, আর তোমরা যা কিছু বলেছ, সে ব্যাপারে আল্লাহই একমাত্র সহায়"। [১২–ইউসুফ : ১৮]

এ কথা বলে আমি অপর দিকে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহ্ আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত সত্য উম্মোচন করে দিবেন। 'আমার বিষয়ে আল্লাহ্ কোন আয়াত নাযিল করবেন

নিজেকে আমি এতখানি যোগ্য মনে করিনি, বরং আমি এতটুকু আশা করেছি যে স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ কে আমার পবিত্রতা সম্পর্কে হয়ত জানিয়ে দিবেন।

আল্লাহর শপথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠেননি এবং বাড়ির কোন লোকও তখন বাইরে যায়নি, এমন সময় নবী ﷺ-এর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হলো, তীব্র শীতের মধ্যে তাঁর চেহারা হতে টপ টপ করে ঘামের ফোটা পড়তে লাগল। আমরা সবাই চুপ হয়ে গেলাম। আমি সম্পূর্ণ নির্ভয় ছিলাম, কিন্তু আমার পিতা-মাতা অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। ওহী অবতরণের অবস্থা শেষ হয়ে গেল রাসূল ﷺ-কে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে হলো। তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় প্রথমেই বললেন, হে আয়েশা! তোমার সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে ওহী নাযিল করেছেন। অত:পর তিনি সূরা নূর এর ১১ নং আয়াত থেকে ২১ নং আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে শুনালেন।

١. اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ لَاتَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ۚ بَلْ هُوَ خَيْرٌلَّكُمْ ۚ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ۚ وَالَّذِيْ تَوَلّٰى كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

٢. لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ـ

٣. لَوْلَا جَاءُوْ عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَاِذْ لَمْ يَاْتُوْا بِالشُّهَدَآءِ فَاُولٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ـ

٤. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيْ مَآ اَفَضْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ـ

٥. اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهٖ عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ـ

٦. وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا ق سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ـ

٧. يَعِظُكُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهٖٓ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

٨. وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ـ

٩. اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ لا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ ـ

١٠. وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ـ

١١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا لا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ـ

১. ইরশাদ হচ্ছে, যারা মিথ্যা অপবাদ রচনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এ অপবাদকে তোমরা নিজেদের জন্য অমঙ্গল মনে করো না। বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্য রয়েছে কৃত পাপ কর্মের ফল। আর তাদের মাঝে যে এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

২. এ কথা শুনার পর বিশ্বাসী পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সৎ ধারণা করেননি? এবং বলেনি যে এটা মিথ্যা অপবাদ।

৩. তারা কেন চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? এজন্য তারা আল্লাহর বিধান মতো মিথ্যাবাদী।

৪. ইহলোক ও পরলোকে তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে নিমগ্ন ছিলে তজ্জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত।

৫. যখন তোমরা মুখে মুখে তা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয়ে মুখ খুলছিলে যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান ছিল না, আর তোমরা একে তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ছিল গুরুতর বিষয়।

৬. আর তোমরা তা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে তোমাদের বলাবলি করা উচিত নয়। আল্লাহ্ পবিত্র ও মহান। এ এক জঘন্য অপবাদ।

৭. আল্লাহ্ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি বিশ্বাসী হও তবে কখনো এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না।

৮. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়।

৯. যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য রয়েছে ইহলোক ও পরলোকে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্ জানেন কিন্তু তোমরা জান না।

১০. তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না এবং আল্লাহ্ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

১১. হে মু'মিনগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেহ্ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কার্যের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা আন নূর : আয়াত-১১-২১)

আয়েশা (রা) বললেন, মা তখন আমাকে বললেন ওঠো মা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শুকরিয়া আদায় কর। আমি বললাম, আমি রাসূল ﷺ শুকরিয়া আদায় করবো না। আমি তো সেই মহান প্রভুর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমার নির্দোষিতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। আপনারা তো এ বানোয়াট অপবাদ ও অভিযোগকে মিথ্যা ঘোষণা করেননি। (বুখারী)

এ ওহী নাযিলের পর মু'মিনদের মনে শান্তি ফিরে এল। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে অপবাদকারী তিনজন মুনাফিক প্রত্যেককে আশিটি করে দোররা মারা হয়। কিন্তু মূল আসামী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে শাস্তি না দিয়ে রাসূল ﷺ তার বিচারের ভার আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন।

ইফ্‌ক এর এ ঘটনাকে পুঁজি করে পাশ্চাত্যের ইসলাম বিদ্বেষী একটা মহল আয়েশা (রা) এর বিষয়ে সমালোচনার অপপ্রয়াস চালানোর চেষ্টা করেছে। অথচ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত আয়েশা (রা)-এর চারিত্রিক সনদ এলে তাদের মিশন প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আল্লাহর কোন কাজ-ই অন্তসার শূন্য নয়, বরং সবকিছুর পশ্চাতেই একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ইফ্‌ক এর এ ঘটনা অবতারণের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হলো বিশ্ব নারী জাতিকে সকল বিপদে দৃঢ়তা অবলম্বন ও ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেয়া।

এ ঘটনাটি ইফকের বা অপবাদ আরোপের ঘটনা হিসেবে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে।

ইফকের ঘটনার মাত্র তিন মাস পর 'জাতুল জ্বায়েশ' যুদ্ধে রাসূল ﷺ গমন করেন। এবারও আয়েশা রাসূল ﷺ-এর সফর সঙ্গী হন এবং তাঁর হারটি হারিয়ে যায়। বিষয়টি তিনি তৎক্ষণাৎ রাসূল ﷺ-কে জানান। ফলে রাসূল ﷺ যাত্রা বিরতির নির্দেশ দেন। হার খুঁজতে খুঁজতে ফজরের ওয়াক্ত প্রায় যায় যায় অবস্থা। এদিকে কাফেলার সাথে এক ফোঁটাও পানি ছিল না। কীভাবে সালাত আদায় করা হবে এ ব্যাপারে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।

আবূ বকর (রা) যথারীতি এ কাফেলার সাথে ছিলেন। তিনি বুঝলেন আয়েশার জন্য এ অবস্থা। তাই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে রাসূল ﷺ-এর তাঁবুতে গেলেন। রাগত কণ্ঠে বললেন, 'আয়েশা! এ কি তোমার আচরণ? তোমার হারের জন্য সমগ্র কাফেলার লোকজন এক চরম বিপদের সম্মুখীন। অযু গোসলের জন্য এক বিন্দু পানিও নেই। এখন লোকজন কেমন করে ফজরের সালাত আদায় করবে? বারে বারে তুমি আমাদেরকে এ কি সমস্যায় ফেলে চলেছ?

আয়েশা (রা) টু শব্দটি পর্যন্তও করলেন না। কারণ রাসূল ﷺ তখন তাঁর কোলে মাথা রেখে চোখ বুঁজেছিলেন। তিনি মনে মনে শুধু আল্লাহর সাহায্য চাইলেন। এ সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহী নাযিল হলো-

وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْجَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ـ

"আর যদি তোমরা পীড়িত হও কিংবা বিদেশ ভ্রমণে থাক, কিংবা তোমাদের কেউ শৌচাগার হতে ফিরে আসে, কিংবা স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এমতাবস্থায় পানি পাওয়া না গেলে পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর। হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল মাসেহ কর, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও মার্জনাকারী।" (সূরা নিসা : আয়াত-৪৩)

তায়াম্মুমের হুকুম নাযিল হওয়ায় উপস্থিত সবাই খুব খুশি হয়ে আয়েশা (রা) ও আবূ বকর (রা)-এর প্রশংসা করতে লাগল। রাসূল ও খুশি মনে সকলকে নিয়ে তায়াম্মুম করে জামা'আতের সাথে ফজর সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে আয়েশা (রা)-কে বহনকারী উট উঠে দাঁড়াতেই দেখা গেল তাঁর হার সেখানে পড়ে আছে। হার পাওয়াতে আবূ বকর (রা) নিজ কন্যার কাছে এসে বললেন, মা আয়েশা! আমি জানতাম না তুমি এতই পুণ্যবতী। তোমাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি যে রহমতের ধারা বর্ষণ করেছেন, তার জন্য হাজারো শোকর। আল্লাহ্ তোমাকে দীর্ঘায়ু দান করুন।

২. ঈলার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ-এর স্ত্রীদের জন্য খাদ্য ও খেজুরের যে পরিমাণ ছিল, প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নেহায়েত অপ্রতুল। তাঁরা অভাবের মধ্যে দিনাতিপাত করতেন। এদিকে ৯ম হিজরী বা আহযাব ও বনু কুরায়জার সমসাময়িককালে আরবের দূর-দূরান্তে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধ বিজয়, বার্ষিক আমদানী বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত গনীমতের মাল সঞ্চয় হতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ -এর হাতে অর্থ-সম্পদের আধিক্য দেখে তাঁরা (নবী পত্নীগণ) সমস্বরে তাঁদের জন্য নির্ধারিত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির আবেদন জানালো। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও ওমর (রা) তাঁদের কন্যাদ্বয় যথাক্রমে আয়েশা ও হাফসা (রা)-কে বুঝিয়ে এ দাবী থেকে বিরত রাখেন।

অপরদিকে অন্যান্য স্ত্রীগণ তাঁদের দাবির ওপর অটল থাকলেন। ঘটনাক্রমে এ সময় মহানবী ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান এবং পাজরে গাছের একটি মূলের সাথে ধাক্কা লেগে আঘাতপ্রাপ্ত হন। (সুনানে আবু দাউদ) স্ত্রীদের এ দাবীতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। আয়েশা (রা)-এর হুজরা সংলগ্ন 'আল-মাশরাবা' নামক গৃহে অবস্থান নেন এবং এক মাস পর্যন্ত কোন স্ত্রীর কাছে না যাওয়ার কসম বা শপথ করেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কুচক্রী মুনাফিকরা সমাজে রটিয়ে

দেয় যে, রাসূলﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে তালাক দিয়েছেন। এ কথা শুনে সাহাবীগণ অস্থির হয়ে পড়েন। তাঁরা মসজিদে নববীতে সমবেত হন। রাসূলﷺ-এর স্ত্রীগণ অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু কেউই রাসূলﷺ পর্যন্ত যাওয়ার সাহস করলেন না।

ওমর (রা) মসজিদে নববীতে এসে ব্যথাতুর অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহﷺ-এর নিকট সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। দু'বার সাড়া না পেয়ে তৃতীয় বারের মাথায় অনুমতি পেয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন মহানবীﷺ একটি চৌকির উপর শুয়ে আছেন, তাঁর শরীর মুবারকে মোটা কম্বলের দাগ পড়ে গেছে। ওমর (রা) ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন সেখানে কয়েকটি মাটির পাত্র ও শুকনো মশক বৈ কিছুই নেই। এ দৃশ্য দেখে ওমর (রা)-এর চক্ষু অশ্রু সিক্ত হয়ে পড়ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহﷺ! আপনি কি আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিবেন? নবীﷺ বললেন, না। ওমর (রা) এ সুসংবাদ লোকদের কে শুনিয়ে দিলেন। ফলে সকল মুসলমান এবং নবী পত্নীগণ চিন্তামুক্ত হন।

আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক এক করে দিন গুণতে ছিলাম। ২৯ দিন পূর্ণ হলে নবীﷺ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সর্বপ্রথম আমার গৃহে আগমন করেন। আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন, আজতো উনত্রিশ দিন হয়েছে। নবীﷺ বললেন : মাস উনত্রিশ দিনেও হয়। (মুসলিম)

৩. তাখাইয়্যিরের ঘটনা

ঈলার ঘটনার পর তাখাইয়্যিরের ঘটনা ঘটে। তাখঈর অর্থ ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দান করা।

পার্থিব ভোগ-বিলাসিতা দ্বারা নিজেকে কুলষিত করতে একদিকে যেমন নবীﷺ নারাজ ছিলেন অন্যদিকে তাঁর স্ত্রীগণ জীবন যাপনের মান বৃদ্ধির জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেন : এ ঘটনা থেকে মুসলিম নারী সমাজ দাম্পত্য জীবনে ধৈর্যধারণ ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় রাখার শিক্ষা পান।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ
زِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا وَإِنْ

كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ـ

"হে নবী! আপনি স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্য পেতে চাও তবে এসো, আমি তোমাদেরকে কিছু দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের গৃহ ভালো মনে কর, তবে তোমাদের মধ্যে যে নেককার তাঁর জন্য আল্লাহ্ বিরাট পুরস্কার ঠিক করে রেখেছেন"। (সূরা-৩৩ আহযাব : আয়াত-২৯)

অর্থাৎ আয়াতটির মূল বক্তব্য হলো : নবী পত্নীদের মধ্যে যার ইচ্ছা দরিদ্র ও অভাব-অনটন মেনে নিয়ে আল্লাহ্র রাসূলের সাথে সংসার ধর্ম পালন করতে পারেন। আর যার ইচ্ছা তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে বললেন, আজ তোমাকে একটি কথা বলছি, খুব তাড়াতাড়ি করে উত্তর না দিয়ে তোমার পিতা-মাতার সাথে জেনে স্থিরভাবে উত্তর দেবে। অতঃপর নবী ﷺ উপরিউল্লিখিত আয়াতটি তাঁকে পাঠ করে শুনালেন এবং বললেন, আল্লাহ্র নিকট থেকে এ হুকুম এসেছে। তৎক্ষণাৎ আয়েশা (রা) বললেন : এ বিষয়ে আমার বাবা-মার নিকট কি জিজ্ঞেস করবো? আমি তো আল্লাহ্, তদীয় রাসূল এবং পরকালের সাফল্যই প্রত্যাশী।

আয়েশা (রা)-এর এ উত্তর শুনে নবী ﷺ অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি বললেন, বিষয়টি তোমার নিকট যেভাবে উপস্থাপন করেছি, ঠিক সেভাবে অন্য স্ত্রীদের নিকটেও করবো। আয়েশা (রা) তাঁর সিদ্ধান্তের কথা কাউকে না জানাতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু নবী ﷺ তা রাখেন নি। তিনি বরং তাঁর অন্যান্য স্ত্রীদের নিকট আয়েশা (রা)-এর সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। (বুখারী) তাঁদের প্রত্যেকেই আয়েশা (রা)-এর মত একই উত্তর দেন। আলোচ্য আয়াত নাযিলের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ৪ জন (সাওদা, আয়েশা, হাফসা ও উম্মু সালামা) মতান্তরে ৯ জন (বাকি ৬ জন উম্মু হাবিবা, সাফিয়া, মায়মুনা, জুআইরিয়া, যয়নব বিনতে জাহাশ) স্ত্রী ছিলেন।

৪. তাহরীমের ঘটনা (হারাম করা)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ মধু খুব পছন্দ করতেন। এ জন্য যয়নাব (রা) তাঁকে প্রায়ই মধুর শরবত তৈরি করে দিতেন। কিন্তু একদিন আছরের পর রাসূল ﷺ যয়নব ঘর থেকে মধু খেয়ে বের হয়ে আয়েশা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলে আয়েশা ও হাফসা বললেন, হে রাসূল! আপনার মুখে "মাগাফীর" নামক এক প্রকার দূর্গন্ধ ফলের গন্ধ আসছে। বিষয়টি আয়েশা (রা) সহ অন্যান্য নবী পত্নীদের পছন্দনীয় ছিল না। রাসূল ﷺ যখন ব্যাপারটি আঁচ করলেন, তখন তিনি আর মধু খাবেন না বলে কসম করলেন।

মহান রাব্বুল আলামীন কিন্তু তাঁর হাবীবের এ কাজটি পছন্দ করলেন না। সাথে সাথে ওহী নাযিল হল, হে প্রিয় নবী–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَٰجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۔ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۔

"আল্লাহ যা কিছু আপনার জন্য বৈধ করেছেন, স্বীয় স্ত্রীদের প্ররোচনায় তাদের মনস্তুষ্টির জন্য হালাল বিষয়কে আপনি অবৈধ বা হারাম বলে অভিহিত কেন করলেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আল্লাহ আপনার কসম ভঙ্গ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা হবে আইনসঙ্গত। আল্লাহ আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সুপরিজ্ঞাত।" (সূরা তাহরীম : আয়াত-১-২)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ আবার মধু পান করা শুরু করলেন। (তারপর রাসূল ﷺ কসমের কাফফারা আদায় করেন) আয়েশা ও হাফসাসহ অন্যান্য নবীপত্নীগণ এ বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট ক্ষমা চাইলেন। তিনি সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনা 'তাহরীম' এর ঘটনা হিসেবে পরিচিত।

যেহেতু এ ঘটনা বহুলাংশে হাফসা (রা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই তাঁর সম্পর্কে আলোচনার স্থানে এ বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। আয়েশা (রা)-এর জীবনে সংঘটিত উপরিউক্ত প্রতিটি ঘটনাই প্রকারান্তে তাঁর ইযযত ও সম্মান বৃদ্ধি করেছে। যা গোটা মানব জাতিকে বহুবিদ কল্যাণের পথ দেখিয়েছে। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ছিলেন বিশ্ব নারী জাতির জন্য গর্ব, আদর্শ ও আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

সচেতন আয়েশা : আয়েশা (রা) অন্ধ অনুকরণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি সবকিছু যাচাই- বাছাই করে তারপর গ্রহণ করতেন। রাসূল ﷺ-এর সময়ে মেয়েরা মসজিদে গিয়ে পুরুষদের পেছনে সালাত আদায়ের অনুমতি ছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তৎকালীন সময়ের মেয়েদের চলাফেরা দেখে আয়েশা (রা) বেশ রাগের সাথে বলেছিলেন, 'রাসূল ﷺ যদি জানতেন, নারীদের কি দশা হবে, তা হলে তিনি বনী ইসরাঈলের মতো নারীদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।'

কা'বা শরীফের চাবিধারী ওসমান (রা) একবার এসে আয়েশা (রা)-কে বললেন, 'কা'বা শরীফের গেলাফ নামানোর পর তা দাফন করা হয়েছে। যেন মানুষের নাপাক হাত তা স্পর্শ করতে না পারে।' আয়েশা (রা) বললেন, 'এটাতো কোন যুক্তিযুক্ত কথা হলো না। গেলাফ খুলে ফেলার পর যার ইচ্ছে তা ব্যবহার করতে পারে। তুমি তা বিক্রি করে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তার মূল্য বিতরণ করে দাও না কেন?'

আয়েশার প্রতি রাসূল ﷺ-এর ভালোবাসা : আয়েশা (রা) সে সৌভাগ্যবান উম্মাহাতুল মু'মিনীন যাঁর কোলে মাথা রেখে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব থেকে অসুস্থাবস্থায় নবী করীম ﷺ আয়েশার গৃহেই ছিলেন, এমন কি তাঁর গৃহেই রাসূল ﷺ-কে দাফন করা হয়। পরবর্তীকালে আবূ বকর (রা) ও ওমর (রা)-কেও রাসূল ﷺ-এর পাশে অর্থাৎ আয়েশার গৃহে দাফন করা হয়।

আসলে রাসূল ﷺ অন্যান্যদের তুলনায় আয়েশা (রা)-কে একটু বেশিই ভালোবাসতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'হে আল্লাহ! যা কিছু আমার আয়ত্তাধীন, (অর্থাৎ স্ত্রীদের মধ্যে সাম্য বজায় রাখা) সে ক্ষেত্রে ইনসাফ থেকে যেন আমি বিরত না থাকি, আর যা আমার আয়ত্তের বাইরে (অর্থাৎ আয়েশার মর্যাদা ও ভালোবাসা) তা ক্ষমা করে দাও। (আবূ দাউদ)

আমর ইবনুল আস (রা) নবীজীকে জিজ্ঞেস করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! দুনিয়ায় আপনার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে? রাসূল ﷺ বললেন, আয়েশা। তিনি বললেন, আমি জানতে চাচ্ছি পুরুষদের মধ্যে কে সবচেয়ে প্রিয়। জবাব দিলেন, আয়েশার পিতা অর্থাৎ আবূ বকর (রা)।'

আয়েশা (রা)ও প্রাণ দিয়ে রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসতেন। নবীজী ইন্তেকালের সময় যে পোশাক পরিহিত ছিলেন পরবর্তীকালে আয়েশা তা যত্ন সহকারে

হেফাযত করেন। একদিন তিনি জনৈক সাহাবাকে নবীজীর কম্বল ও তহবন্দ (লুঙ্গি জাতীয়) দেখিয়ে বলেন, 'খোদার কসম, এ কাপড় পরিধান করে রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন।' জীবনের শুরুতেই আয়েশা (রা) বিধবা হন, এরপর তিনি ৪৮ বছর জীবিত ছিলেন। এ ৪৮ বছর তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে রাসূলের রেখে যাওয়া কাজের তদারকি করেছেন।

রাসূল ﷺ-এর ওফাতের পর আবূ বকর (রা)-এর খেলাফাতকে স্বীকার করে বাই'আতকালে নবী পত্নীগণ উসমানের মাধ্যমে মীরাছি দাবি করার উদ্যোগ নিলে আয়েশা (রা) সকলকে স্মরণ করে দিয়ে বলেন, 'রাসূল ﷺ বলে গেছেন, কেউ আমার ওয়ারিশ হবে না। আমার রেখে যাওয়া জিনিস হবে ছদকা।'

আয়েশা (রা) পোশাক পরিচ্ছদ পরার ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতেন। একবার তাঁর ভাইঝি হাফছা বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে তাঁর সামনে আসলে তিনি ওড়নাটি ছুড়ে ফেলে বলেন, 'সূরা নূর-এ আল্লাহ তা'আলা কি বলছেন, তুমি কি পড়নি?' এরপর একটা মোটা কাপড়ের ওড়না তাকে দেন।

আয়েশা (রা) কোনো এক বাড়িতে একবার বেড়াতে যান। সেখানে বাড়ির মালিকের দু'জন মেয়েকে চাদর ছাড়াই সালাত পড়তে দেখে বলেন, 'আগামীতে বিনা চাদরে কখনো সালাত পড়বে না।'

পরামর্শক আয়েশা (রা) : আবূ বকর (রা)-এর আমল থেকে আয়েশা (রা) বিভিন্ন জটিল বিষয়ে সাহাবাদেরকে পরামর্শ দিতেন। এ সময় থেকেই তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর হাদীস বর্ণনা করতে থাকেন এবং ফতোয়া দেয়া শুরু করেন।

ওমর (রা)-এর শাসনামলে যখন তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদকে সেনাপতির পদ থেকে পদচ্যুত করেন, তখন এ সংবাদ পাওয়ার পর আয়েশা (রা) খলিফাকে পরামর্শ দেন খালিদকে সাধারণ সৈনিক হিসেবে রাখার জন্য। তা না হলে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে বলে তিনি আংশকা করছিলেন। ওমর (রা) মা আয়েশার কথা অনুযায়ী কাজ করেন।

মিসর অভিযানে আমর ইবনুল আস যখন সুবিধা করতে পারছিলেন না, তখন আয়েশা (রা) ওমর (রা)-কে তাড়াতাড়ি জোবায়েরের নেতৃত্বে নতুন সৈন্য বাহিনী মিসরে পাঠানোর পরামর্শ দেন। খলিফা সে অনুযায়ী কাজ করলেন। ফলে অল্পদিনেই মিসর মুসলমানদের পদানত হয়।

ইরাক বিজয়ের পর গণীমতের মালের মধ্যে এক কৌটা মণি-মুক্তা পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ-এর প্রিয় স্ত্রী হিসেবে আয়েশা (রা) বলেন, 'রাসূল ﷺ-এর পর খাত্তাবের পুত্র ওমর আমার প্রতি বিরাট অনুগ্রহ করছেন। হে আল্লাহ! তাঁর দানের জন্য আগামীতে আমাকে বাঁচিয়ে রেখো না।'

ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের সকলকে বার্ষিক দশ হাজার দিরহাম বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। কিন্তু আয়েশা (রা)-এর জন্য বার হাজার দিরহাম ধার্য করা হয়। এর কারণ উল্লেখ করে ওমর (রা) বলেন, ' আয়েশা (রা) ছিলেন নবীজীর অতি প্রিয়।'

মৃত্যুর আগে ওমর (রা)-এর পুত্র আবদুল্লাহকে আয়েশা (রা)-এর নিকট পাঠান তাঁর লাশ রাসূল ﷺ-এর পাশে দাফন করার অনুমতির জন্য। আবেদন পেশ করলে আয়েশা (রা) বলেন, 'স্থানটি আমার নিজের জন্য রাখলেও ওমরের জন্য তা আনন্দের সাথে ত্যাগ করছি।'

আয়েশা (রা)-এর অনুমতি পাওয়ার পরও ওমর (রা) ওছিয়াত করে যান, 'আমার মৃতদেহ আস্তানার সামনে রাখবে। অনুমতি পাওয়া গেলে ভেতরে দাফন করবে, অন্যথায় সাধারণ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করবে।' সে অনুযায়ী কাজ করা হয়। আয়েশা (রা)-এর অনুমতি পাওয়ার পর হুজরার ভেতর ওমর (রা)-এর লাশ দাফন করা হয়।

ওসমান (রা)-এর খিলাফতকালে বিভিন্ন বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর নিকট থেকে যুক্তি পরামর্শ গ্রহণ করা হতো এবং সে অনুযায়ী কাজ করা হতো। তাঁর সময়ের প্রথম দিকে রাজ্যে হট্টগোল দেখা দিলে মুহাম্মদ বিন আবূ বকরসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ খলিফার পদত্যাগের দাবি নিয়ে আয়েশার কাছে আসেন। আয়েশা (রা) বলেন, 'না, তা হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি ওসমানের হাতে খেলাফতের দায়িত্ব আসে তাহলে সে যেন তা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ না করে।'

ওসমান (রা)-এর খেলাফাতের শেষ দিকে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে দুঃশাসনের অভিযোগ উঠলে আয়েশা (রা)-এর পরামর্শ অনুযায়ী তাদেরকে রাজধানীতে তলব করা হয় এবং গভর্নরদের পেশকৃত দলিল-দস্তাবেজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় একটি তদন্ত কমিটির মাধ্যমে। এ তদন্ত কমিটিও আয়েশা (রা)-এর পরামর্শে গঠিত হয়।

ইসলাম প্রচারের শুরু থেকেই মুনাফিকরা আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছিল। ওসমান (রা)-এর সময়ে এসে তারা খুবই সুকৌশলে কাজ শুরু করে এবং ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের ফলে তা আরো বিস্তৃতি লাভ করে। আলী (রা) এমনি এক দুঃখজনক পরিস্থিতিতে মুসলিম বিশ্বের খলীফা হন। খিলাফাত প্রাপ্তির পর পরই তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় ওসমান হত্যার বিচার করার জন্য।

কিন্তু ঘটনা এমন ছিল যে, হত্যাকারী কে বা কারা তা সঠিক করে কেউ জানতো না। ওসমান (রা)-এর স্ত্রী নাইলা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও কাউকে চিনতে পারেননি। ফলে কাউকে সাজা দেয়া যাচ্ছিল না। চক্রান্তকারীরা এ সুযোগটিই গ্রহণ করল। তাদের প্ররোচনায় কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবাও ওসমান হত্যার বিচার দাবি করলেন। এদের মধ্যে আয়েশা, তালহা ও যুবাইর (রা)-এর মতো লোকও ছিলেন। তাঁরা আয়েশার নেতৃত্বে মক্কা থেকে বসরার দিকে যাত্রা করেন, সেখানে ওসমান হত্যার বিচার দাবিকারীদের সংখ্যা ছিল বেশি। এহেন সংবাদে আলী (রা) সেনাদলসহ সেখানে পৌছান এবং দু'বাহিনী মুখোমুখি অবস্থান নেয়। যেহেতু উভয়পক্ষ সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, ফলে আলাপ আলোচনার পর বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়।

কিন্তু চক্রান্তকারীরা এ ধরনের পরিস্থিতির পক্ষে ছিল না। তাই তারা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাতের আধারে এক পক্ষ অপর পক্ষের ওপর আক্রমণ চালায়, আর প্রচার করতে থাকে যে অপর পক্ষ সন্ধির সুযোগ নিয়ে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছে। এতে যুদ্ধ বেধে যায় এবং আরো ভয়াবহ রূপ নেয়। উভয়পক্ষে প্রচুর শহীদ হন। শেষ পর্যন্ত আলী জয়লাভ করেন এবং আয়েশা (রা)-কে সসম্মানে মদীনা পাঠিয়ে দেন।

এ যুদ্ধে আয়েশা (রা) উটে আরোহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছিলেন বলে ইতিহাসে এটা জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

আয়েশা (রা)-এর বদান্যতা : আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে আয়েশা (রা)-এর খেদমতে তিনি এক লক্ষ দিরহাম উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) ঐদিন সন্ধ্যার আগেই পুরো এক লক্ষ দিরহাম গরীব মিসকীনদের মধ্যে দান করে দিলেন। ঐদিন তিনি রোযা ছিলেন। কিন্তু তিনি ইফতার করার জন্যেও কিছু রাখেন নি। তাই তার দাসী আরজ করলো, 'ইফতারের জন্য তো

কিছু রাখা প্রয়োজন ছিল।' উত্তরে আয়েশা (রা) বললেন, 'মা! তোমার এ বিষয়ে পূর্বে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত ছিল।'

আয়েশা (রা)-এর বৈশিষ্ট্য : আয়েশা (রা) অনেক ক্ষেত্রে অনেকের চেয়ে বিশিষ্ট ছিলেন। উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে তাঁর ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য ছিল ব্যতিক্রমধর্মী। তিনি নিজেই বলেন, 'এটি আমার অহংকার নয়, বরঞ্চ প্রকৃত ঘটনা এই যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনেকগুলো কারণে দুনিয়ার সকলের চেয়ে আমাকে বিশেষভাবে সম্মানিতা করেছেন। তারই কথা–

১. আমার বিবাহের পূর্বে আমার ছবি ফেরেশ্‌তাগণ রাসূলুল্লাহর সামনে রেখেছিলেন।
২. যখন আমার ৬/৭ বছর বয়স তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমায় বিয়ে করেছিলেন।
৩. ৯/১০/১১ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়িতে পদার্পণ করেছি।
৪. আমি ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন স্ত্রী কুমারী ছিল না।
৫. রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমার নিকট একই বিছানায় থাকতেন তখন প্রায়ই তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো।
৬. আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী ছিলাম।
৭. আমাকে লক্ষ্য করে সূরা নূরের এবং তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে।
৮. আমি চর্মচক্ষে দু'বার জিবরাঈল (আ)-কে দেখেছি।
৯. রাসূলুল্লাহ ﷺ আমারই কোলে পবিত্র মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন।
১০. আমি রাসূল ﷺ-এর খলিফার কন্যা এবং সিদ্দিকা। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে যাদেরকে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকার ওয়াদা দিয়েছেন, আমি তাদেরও অন্যতম।

আয়েশা (রা) ছিলেন একজন মহৎ হৃদয়ের মানুষ। কবি হাসসান বিন সাবিত ইফকের জঘন্য অপবাদকারীদের মধ্যে শামিল ছিলেন। তবুও কবি সাবিত যখন আয়েশা (রা)-এর মজলিসে আসতেন তিনি সাদরে তাকে বরণ করে নিতেন। অন্যরা সাবিতের কৃতকর্মের জন্য সমালোচনা ও নিন্দা করলে তিনি বলতেন, 'তাকে মন্দ বলো না। সে বিধর্মী ও পৌত্তলিক কবিদের কবিতার উত্তর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে প্রদান করতো।'

আয়েশা (রা)-এর ছিল প্রচণ্ড সাহস ও আত্মিক মনোবল। যে কারণে তিনি ওহুদ যুদ্ধের সময় আহতদের সেবা করতে পেরেছিলেন। তিনি সেখানে দৌড়াদৌড়ি করে মশক (কলস জাতীয় চামড়ার তৈরি এক প্রকার পানির পাত্র) কাঁধে নিয়ে তৃষ্ণার্তদের পানি পান করিয়েছিলেন। তিনি উষ্ট্রের যুদ্ধের এক পক্ষের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এমনিতেও তিনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণের প্রবল ইচ্ছা পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন। রাতের বেলা তিনি একাকী কবরস্থানে গমন করতেন।

রাসূল ﷺ জীবিত থাকতে তিনি তাঁর সাথে রাতের বেলা তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন। অধিকাংশ দিন তিনি রোযা রাখতেন।

ইশরাকের সালাত সম্বন্ধে আয়েশা (রা) নিজে বলেছেন, 'আমি নবীজীকে কখনো ইশরাকের সালাত পড়তে না দেখলেও আমি নিজে তা পড়ি। তিনি অনেক কিছু পছন্দ করতেন, উম্মতের ওপর ফরয হয়ে যাবে এ আশংকায় তদনুযায়ী আমল করতেন না।'

আয়েশা (রা)-এর পাণ্ডিত্য : আয়েশা (রা)-এর পাণ্ডিত্যের বিবরণ শুনলে অবাক হতে হয়। তিনি কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূল, ইজমা, কিয়াস, সাহিত্য, ইতিহাস, রসায়ন, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি শিক্ষকতা ও বক্তৃতায় পারদর্শী ছিলেন। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল কমপক্ষে বার হাজার।

এ জন্যই আয়েশা (রা) সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, 'শরীয়তের অর্ধেক বিদ্যাই তোমরা ঐ রক্তাভ গৌরবর্ণা মহিয়সীর নিকট থেকে শিখতে পারবে।'

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলেন, 'সাহাবী হিসেবে আমাদের সামনে এমন কোনো কঠিন বিষয় উপস্থিত হয়নি, যা আয়েশাকে জিজ্ঞেস করে তাঁর কাছে কিছু জানতে পারিনি।'

বিশিষ্ট সাহাবী আবূ সালমা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ বলেন, 'আয়েশার চেয়ে সুন্নাতে নববীর বড় আলেম, দ্বীনের সূক্ষ্মতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, কালামে মজীদের আয়াতের শানে নুযূল এবং ফারায়েয সম্পর্কে বেশি জ্ঞানের অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।'

আতা ইবনে আবূ রেবাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেন, 'আয়েশা ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে উত্তম মানুষ এবং লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুস্থ মতের অধিকারিণী।

ইমাম যুহরী বলেন, 'সকল পুরুষ এবং উম্মুল মু'মিনীনদের সকলের ইলম একত্রে করা হলেও আয়েশার ইলম হবে তাদের সবার চেয়ে বেশি।"

হাদীস শাস্ত্রে আয়েশা (রা)-এর অবদান : আয়েশা (রা) মোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে ১৭৪টি হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ঐকমত্যে পৌঁছেছেন। ইমাম বুখারী (র) তাঁর কাছ থেকে এককভাবে ৫৪টি হাদীস এবং ইমাম মুসলিম (র) ৬৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবী ও তাবেয়ী মিলে মোট দুই শতাধিক রাবী আয়েশা (রা)-এর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মাসরুক, আসওয়াদ, ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়াহ, কাসেম প্রমুখ সাহাবিগণ। কারো মতে তিনি শরীয়তের এক-চতুর্থাংশ নির্দেশাবলী বর্ণনা করেছেন। নিচে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিসত্তা বিষয়ক

١. عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضى) قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ ؟ قَالَتْ : بِالسِّوَاكِ .

১. শুরাইহ বলেন : আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী ﷺ ঘরে এসে কোন কাজটি প্রথম করতেন। তিনি বললেন : মিসওয়াক।

(মুসলিম : হাদীস নং-৫৯০)

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ شَعْرُ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَوْقَ الْوَفْرَةِ دُوْنَ الْجُمَّةِ .

২. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার চুল কানের লতির উপরে এবং অল্প নিচ পর্যন্ত থাকতো। (আবু দাউদ : হাদীস নং-৪১৮৭)

٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : مَاشَبِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خُبْزِ شَعِيْرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى الْمَوْتِ ـ

৩. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু অবধি ক্রমাগত দু'দিন পেট ভরে রুটি খেতে পারেননি। (তিরমিযী)

٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتّٰى قَبَضَهُ اللّٰهُ ـ

৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন। (তিরমিযী : হাদীস নং-৮০৩)

٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : مَاضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَادِمًا لَهٗ وَ لاَ امْرَاَةً وَّلاَ ضَرَبَ بِيَدِهٖ شَيْئًا ـ

৫. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাকর এবং কোন স্ত্রীকে মারেননি। এমন কি তিনি স্বীয় হস্তে কোন বস্তুকে প্রহার করেন নি। (ইবনে মাজাহ)

পারিবারিক প্রসঙ্গে

٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهَا اُرِيْتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ اَرٰى اَنَّكِ فِىْ سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيْرٍ وَيَقُوْلُ هٰذِهٖ اِمْرَاَتُكَ فَاَكْشِفُ عَنْهَا فَاِذَا هِىَ اَنْتِ فَاَقُوْلُ اِنْ يَّكَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ يُمْضِهٖ ـ

৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ তাকে বলেছেন, বিয়ের পূর্বে স্বপ্নের মাঝে দু'বার তোমাকে আমায় দেখানো হয়েছে। আমি স্বপ্নে দেখি যে, তুমি একখণ্ড রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। আমাকে বলা হলো, ইনি আপনার স্ত্রী। তারপর আমি তার মুখাবরণ উন্মোচন করে দেখি যে, সে তুমিই। তখন আমি মনে মনে বললাম, এ স্বপ্ন যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তবে তা তিনি কার্যকর করবেনই। (বুখারী : হাদীস নং-৬২৮৩; আবু দাউদ)

٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّهَا قَالَتْ : كُنْتُ أَكُوْنُ نَائِمَةً وَ رِجْلَاىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَيُصَلِّىْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاِذَا أَرَادَ أَنْ يَّسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَىَّ، فَقَبَضْتُهَا فَسَجَدَ ـ

৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার পা দু'টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে থাকত। তিনি রাতের সালাত পড়তেন। যখন সিজদা করতে চাইতেন আমার পায়ে খোচা দিতেন। আমি পা সংকোচিত করে নিতাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদা করতেন। (আবু দাউদ)

٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ حَىَّ اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِيْزَرَ وَاَيْقَظَ أَهْلَهٗ ـ

৭. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রমযান মাসের শেষ দশক আসলেই নবী ﷺ রাত্রি জেগে ইবাদত করতেন, তাঁর কোমর শক্তভাবে বেঁধে নিতেন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে (ইবাদতের জন্য) জাগাতেন। (আবু দাউদ)

٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ، وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ ـ

৮. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের নিকট উত্তম। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮)

٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يَّقُوْمَ عَنِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَرْفَعَ ـ

৯. আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ মেযবানকে মেহমানের খাওয়া শেষ হওয়ার পূর্বে খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

(সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ১৩৭।)

١٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ :دَخَلَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيْتَ فَرَأَى كَسْرَةً مُلْقَاةً فَأَخَذَهَا فَمَسَّحَهَا ثُمَّ أَكَلَهَا - وَ قَالَ يَا عَائِشَةُ أَكْرِمِىْ كَرِيْمًا ، فَإِنَّهَا مَا نَفَرَتْ عَنْ قَوْمٍ قَطٌّ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ -

১০. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ একদা ঘরে প্রবেশ করে উল্টো করে ফেলে রাখা একটি খাবারের পাত্র দেখে তা হাতে উঠিয়ে নিলেন এবং তা মুছে খেয়ে ফেললেন আর বললেন : হে আয়েশা (রা)! খাবারকে সম্মান কর, কেননা তা যে সম্প্রদায় হতে বিরাগ ভাজন হয়ে বেরিয়ে গেছে কোন দিন তাদের কাছে তা আর ফিরে আসে না। (তিরমিযী)

١١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كُنْتُ أَضَعُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثَةَ اٰنِيَةٍ مِّنَ اللَّيْلِ مَخْمَرَةً : اِنَاءً لِطُهُوْرِهِ وَ اِنَاءً لِّسِوَاكِهِ وَ اِنَاءً لِّشَرَابِهِ -

১১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তিনটি পাত্র ঢেকে রাখতাম। একটি অজুর জন্য, একটি মিসওয়াকের জন্য আর একটি পান করার জন্য। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ৩০)

١٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ -

১২. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন : "প্রত্যেক নেশাকর পানীয়ই হারাম। (আল-বুখারী : ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮; তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮।)

١٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا مُصِيْبَةٌ تُصِيْبُ الْمُسْلِمَ اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا عَنْهُ حَتّٰى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا -

১৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কোন মুসলমানের ওপর আপতিত বিপদ তার পাপরাশি ক্ষমার কাফফারা হয়ে থাকে। এমনকি একটা কাঁটা ফুটলেও। (সহীহ আল-বুখারী : ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৪৩।)

١٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَازَالَ جِبْرَئِيلُ يُوْصِيْنِى عَنِ الْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ يُوَرِّثُهُ -

১৪. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : জিব্রাঈল (আ) সদা-সর্বদা আমার প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করেন। আমার ধারণা হচ্ছে যে, অচিরেই প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন। (বুখারী)

١٥. كَانَ بَيْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُوْمَةٌ فِى الْاَرْضِ. وَاَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهَا فَقَالَتْ : يَا اَبَا سَلَمَةَ اِجْتَنِبِ الْاَرْضَ، فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِّنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرْضِيْنَ -

১৫. আবূ সালামা ও তাঁর জাতির সাথে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিরোধ ছিল। আবূ সালামা (রা) আয়েশা (রা)-এর কাছে এসে তাঁকে এ বিষয়টি জানালে তিনি বললেন : হে আবূ সালামা! ঐ জমি হতে বিরত থাক। কেননা নবী ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি এক বিঘত জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, কিয়ামতের দিন এর সাত স্তবক জমিন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়া হবে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩।)

১৬. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে দোয়া করতেন এ বলে–

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে পাপ ও ঋণগ্রস্ততা হতে আশ্রয় চাই।

জনৈক ব্যক্তি বললেন, হে রাসূল ﷺ আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে বেশি পরিমাণে আশ্রয় চান কেন? নবী ﷺ বললেন : কেউ ঋণগ্রস্ত হলে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, ওয়াদা খিলাফ করে। (নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭)

١٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا اَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا .

১৭. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : যখন কোন স্ত্রী তার স্বামীর ঘর থেকে সৎপথে খাদ্য ব্যয় করে সে তাঁর এ দানের পুণ্য লাভ করবে। তাঁর স্বামীও উপার্জনকারী হিসেবে এর পুরস্কার পাবে। আর তা রক্ষণাবেক্ষণকারীও অনুরূপ পুণ্য লাভ করবে। কারো পুরস্কার কম করে দেয়া হবে না। (আল-বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২)

১৮. উরওয়া ইবনে যুবাইর (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আয়েশা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তেকালের পর তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) আবূ বকর (রা)-এর কাছে গিয়ে বললেন, আল্লাহর দেয়া সম্পদ হতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যা রেখে গিয়েছেন তা বণ্টন করে আমার উত্তরাধিকারের অংশ বুঝিয়ে দিন। আবূ বকর (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : لاَ نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ -আমরা যা রেখে গেলাম তাঁর কোন উত্তরাধিকার হবে না, বরং তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে।

١٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِّنْ مَسَاكِيْنَ، وَ قَالَ غَيْرَ : اَوْ عِدَّةً مِّنْ صَدَقَةٍ، فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِعْطِىْ وَلاَ تُحْصِىْ فَيُحْصٰى عَلَيْكِ .

১৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি কিছু মিসকীন কিংবা কিছু সাদকা প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন : দান করে দাও, গুণে গুণে দিবে না, তাহলে তোমাকেও সাওয়াব গুণে গুণে দেয়া হবে।

(আবূ দাউদ : ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮)

٢٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَمَرَ اَنْ يُّسْتَمْتِعَ بِجُلُوْدِ الْمَيْتَةِ اِذَا دُبِغَتْ ـ

২০. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগত তথা পরিশোধন করে তা থেকে উপকৃত হবার অনুমতি রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রদান করেছেন। (আবু দাউদ : ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৯)

٢١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَاْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ دِيْنَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِيْنَارٍ، وَمِنَ الْاَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا ـ

২১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি বিশ দীনার বা এর বেশি হলে অর্ধ দীনার এবং প্রতি চল্লিশ দীনারে এক দীনার যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতেন। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ১২৮)

রাজনীতি বিষয়ক

রাজনৈতিক বলতে এখানে দ্বীন প্রতিষ্ঠাকল্পে কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান ও খিলাফত সংক্রান্ত বর্ণনাকে বুঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও আয়েশা (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো–

٢٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمَّا رَجَعَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ اَتَاهُ جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ : قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ وَاللّٰهِ مَا وَضَعْنَاهُ، اُخْرُجْ اِلَيْهِمْ ـ قَالَ : فَاِلٰى اَيْنَ؟ قَالَ : هٰهُنَا، وَ اَشَارَ اِلٰى بَنِىْ قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَيْهِمْ ـ

২২. আয়েশা (রা) বলেন : নবী ﷺ যখন খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যুদ্ধাস্ত্র খুলে গোসল করলেন, তখন জিব্রাঈল (আ) এসে বললেন, আপনি যুদ্ধের অস্ত্র খুলে ফেলেছেন। অথচ আল্লাহর শপথ আমরা তা খুলিনি। আপনি তাদের দিকে বের হন। নবী ﷺ বললেন, কোন দিকে বের হবো? জিব্রাঈল (আ) বনূ

কুরায়জার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন : ঐদিকে। অত:পর নবী ﷺ তাদের দিকে বের হয়ে পড়লেন। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯০)

٢٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِالْاَمِيْرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ صِدْقٍ، اِنْ نَسِىَ ذَكَّرَهُ وَ اِنْ ذَكَرَ اَعَانَهُ ـ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيْرَ سُوْءٍ اِنْ نَسِىَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَاِنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ ـ

২৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূল ﷺ বলেছেন : আল্লাহ যখন কোন নেতার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে একজন সত্যবাদী মন্ত্রী (উযীর) দান করেন। যিনি তাঁকে কিছু ভুলে গেলে স্মরণ করিয়ে দেন। আর কিছু স্মরণ করতে তাকে সহায়তা করেন। অপর পক্ষে আল্লাহ যে নেতার অমঙ্গল চান, তাকে একজন খারাপ উযীর দান করেন যে তাকে ভুলে গেলেও স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর কিছু স্মরণ করলেও তাকে সহায়তা করে না।

(আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৭)

٢٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ اِلٰى بَدْرٍ حَتّٰى اِذَا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرِ لَحِقَهُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَذْكُرُ مِنْهُ جَرَاةً وَنَجْدَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ : اَتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ؟ قَالَ : لاَ قَالَ : اِرْجِعْ فَلَنْ اَسْتَعِيْنَ بِمُشْرِكٍ ـ

২৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বদর যুদ্ধে যাবার পথে হাররাতুল ওয়াবার নামক স্থানে যখন পৌঁছালেন, তখন একজন মুশরিক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাত করে নিজের শক্তি ও সাহসের পরিচয় দিল। অতঃপর মহানবী ﷺ বললেন, তুমি কী আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান রাখ? সে বলল, জী না। মহানবী ﷺ বললেন : আমি কোন মুশরিকের নিকট সাহায্য-সহযোগিতা চাইব না। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৪)

٢٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عُثْمَانُ اِنْ وَّلاَكَ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ يَوْمًا فَاَرَادَكَ الْمُنَافِقُوْنَ اَنْ تَخْلَعَ قَمِيْصَكَ الَّذِىْ قَمَّصَكَ اللّٰهُ فَلاَ تَخْلَعْهُ يَقُوْلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ النُّعْمَانُ : فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُعَلِّمِى النَّاسَ بِهٰذَا؟ قَالَتْ : اُنْسِيْتُهُ ـ

২৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসমান (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন : হে উসমান! আল্লাহ্ যদি কোন দিন তোমাকে নেতৃত্ব দান করেন, তবে মুনাফিকরা আল্লাহর দেয়া নেতৃত্বের ঐ জামা তোমার থেকে খুলে নিতে চাইলে তুমি তা খুলে দিবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বললেন। হাদীসের বর্ণনাকারী নু'মান বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, জনগণকে এ সংবাদটি জানতে দিতে আপনাকে কোন জিনিস বারণ করল? তিনি বললেন, আমাকে (তখন তা) ভুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ১১)

٢٦. عَنِ الْاَسْوَدِ (رضى) قَالَ : ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ اَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا ـ فَقَالَتْ : مَتٰى اَوْصٰى اِلَيْهِ؟ فَلَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ اِلٰى صَدْرِىْ اَوْ اِلٰى حُجْرِىْ فَدَعَا بِطُسْتٍ فَلَقَدْ انْخَنَثَ فِىْ حُجْرِىْ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتُ بِهِ، فَمَتٰى اَوْصٰى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ

২৬. আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-এর নিকটে আলী (রা)-এর (কথিত) খিলাফতের ওসিয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখন খিলাফতের ব্যাপারে তাঁর প্রতি ওসিয়ত করলেন? আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে) আমার কোলে বা বুকে ঠেস লাগিয়ে রেখেছিলাম। তখন তিনি একটি গামলা আনতে বললেন। আমার কোলের মধ্যেই গামলাটি কাত করলেন। পরে তিনি মারা যান। অথচ আমি বুঝতেও পারিনি। এমতাবস্থায় কখন তিনি ওসিয়ত করলেন?

(ইবনে মাজাহ, পৃ. ১১৭)

٢٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ مِنْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ـ

২৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : সুদ সংক্রান্ত সূরা বাকারা-এর আয়াত যখন নাযিল হলো, তখন নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে লোকদেরকে তা শিক্ষা দিলেন। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ, ৬৫)

٢٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَثَلُ الَّذِىْ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ، وَمَثَلُ الَّذِيْ يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيْدٌ فَلَهُ اَجْرَانِ ـ

২৮. আয়েশা (রা) মহানবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল কুরআন পড়ে এবং মুখস্থ করে সে মহান লিপিকারদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি পড়ে এভাবে যে, সে তা বুঝার চেষ্টা করে এবং এ ক্ষেত্রে যে বড়ই যত্নবান তার জন্য আছে দ্বিগুণ পুণ্য। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩৫)

٢٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ ... اَلْاٰيَةُ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : اِذَا رَاَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ سَمَّاهُمُ اللّٰهُ، فَاحْذَرُوْهُمْ ـ

২৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহর এ বাণী প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো– "সে মহান সত্তা যিনি আপনার ওপর কুরআন নাযিল করেছেন যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট অর্থবোধক যেগুলো কিতাবের মূল বিষয়। অপর কিছু আয়াত অস্পষ্ট। যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তারা ফিতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টির লক্ষ্যে অস্পষ্ট আয়াতগুলো অন্বেষণ করে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যখন তোমরা ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখবে যারা অস্পষ্ট আয়াতগুলো অনুসরণ করে, জানবে তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তাদের থেকে সাবধান হয়ে চলো। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড পৃ. ১২৮)

٣٠. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ إِذَا اَوٰى اِلٰى فِرَاشِهٖ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيْهِمَا فَقَرَاَ بِهِمَا قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهٖ يَبْدَاُ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهٖ وَوَجْهِهٖ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهٖ يَفْعَلُ ذٰلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

৩০. আয়েশা (রা) বলেন : প্রতি রাতে বিছানায় শয়ন করার সময় নবী ﷺ দু'হাতের তালু একত্রিত করে তাতে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁক দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ডল হতে সারা শরীর তিন বার মাসেহ করতেন।
(তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭)

٣١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْفُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا ثَقُلَ كُنْتُ اَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ وَاَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهٖ بِبَرْكَتِهَا ، فَسَاَلْتُ اِبْنَ شِهَابٍ كَيْفَ كَانَ يَنْفُثُ؟ قَالَ : يَنْفُثُ عَلٰى يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهٗ.

৩১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ যে অসুখে মৃত্যুবরণ করলেন তাতে আশ্রয় প্রার্থনার দু'আ দ্বারা নিজের ওপর ঝাড়-ফুঁক করছিলেন। অত:পর তিনি যখন ভারী (শক্তিহীন বিহ্বল) হয়ে গেলেন তখন আমি ঐ গুলোর দ্বারা ঝাড়-ফুঁক দিচ্ছিলাম এবং তিনি ঐসবের বরকত হাসিলের জন্য নিজের হাত বুলাচ্ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী বলেন যে, আমি ইবন হিশাবকে জিজ্ঞেস করলাম : তাঁর ঝাড়-ফুঁক কেমন ছিল? তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি তাঁর দু'হাতে ফুঁক দিতেন। তারপর এর দ্বারা মুখমণ্ডল মুছতেন।

٣٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَلْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ.

৩২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : জ্বর জাহান্নামের উত্তাপ থেকে হয়ে থাকে। সুতরাং পানি দিয়ে তোমরা তা ঠাণ্ডা করো।
(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬ ও তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭)

٣٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَتْ اُمِّىْ تُعَالِجُنِىْ لِلسِّمْنَةِ تُرِيْدُ اَنْ تَدْخُلَنِىْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ. فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذٰلِكَ حَتّٰى اَكَلْتُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ، فَسَمِنْتُ كَاَحْسَنَ سَمِنَةً -

৩৩. আয়েশা (রা) বলেন, আমার মা আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রেরণ করার জন্য মোটা তাজা করার চেষ্টা করছিলেন। এ জন্য অনেক কিছু ভক্ষণ করলেও তাঁর উদ্দেশ্য অর্জিত হচ্ছিল না। অবশেষে পাকা খেজুরের সাথে কাকুড় মিশিয়ে খেয়ে বেশ মোটাতাজা হলাম। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ২৩৮)

٣٤. عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ : خَرَجْنَا وَمَعَنَا غَالِبُ بْنُ الْجَبْرِ فَمَرِضَ فِى الطَّرِيْقِ فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ فَعَادَهُ اِبْنُ اَبِىْ عَتِيْقٍ وَقَالَ لَنَا : عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ فَخُذُوْا مِنْهَا خَمْسًا اَوْ سَبْعًا فَاسْتَحِقُّوْهَا ثُمَّ اَقْطِرُوْهَا فِىْ اَنْفِهِ بِقَطِرَاتِ زَيْتَ فِىْ هٰذَا الْجَانِبِ وَفِىْ هٰذَا الْجَانِبِ فَاِنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : اِنَّ هٰذِهِ الْحَبَّةُ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ السَّامُّ -

৩৪. খালিদ ইবনে সাদ (রা) বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। গালিব ইবনে জাবের আমাদের সাথে ছিলেন। তিনি রাস্তায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে অসুস্থ অবস্থায় নিয়ে আমরা মদীনায় পৌঁছলাম। ইবনে আবু আতীক তাঁকে দেখতে এসে বললেন, তোমাদের উচিত কালো জিরা দিয়ে তার চিকিৎসা করা। পাঁচ বা সাতটি কলো জিরার দানা নিয়ে তা পিষে তেলের সাথে মিশিয়ে নাকের দু'পাশে ফোঁটা ফোঁটা করে দিবে। কেননা, আয়েশা (রা) তাঁদেরকে বলেছেন, তিনি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, নবী ﷺ বলেছেন : এ কালো জিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক।

٣٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَرَأْسُهُ فِىْ حُجْرِىْ وَأَنَا حَائِضٌ .

৩৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি ঋতুবতী থাকাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করতেন।

(আল-বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১২৫)

٣٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ فَتَاْتَزِرْ بِاِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا .

৩৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের (নবীপত্নী) কারো মাসিক স্রাব শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আদেশ করতেন চাদর দিয়ে নিজেকে আবৃত করে রাখতে। অত:পর তিনি তার সাথে মিলিত হতেন।

(সহীহ মুসলিম : ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪১)

٣٧. قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلٰى عَائِشَةَ (رضى) سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ : سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا اَهْلُهَا اَتُسْتَاْمَرُ اَمْ لاَ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَعَمْ تُسْتَاْمَرُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّهَا تَسْتَحْيِىْ؟ فَقَالَ : فَذٰلِكَ اِذْنُهَا اِذَا هِىَ سَكَتَتْ .

৩৭. আয়েশা (রা)-এর গোলাম যাকওয়ান (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছি যে, কোন মেয়েকে তার অভিভাবক বিবাহ দেয়ার সময় মেয়ের অনুমতি নিতে হবে কি? নবী ﷺ বললেন, হ্যাঁ, নিতে হবে। আমি বললাম : সে মেয়ে তো লজ্জাবোধ করবে। নবী ﷺ বললেন, নীরবতা পালন করাই তার সম্মতির লক্ষণ।

(মুসলিম : ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৫)

٣٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِى بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَ قَالَ يَا اَسْمَاءَ : اِنَّ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ لَمْ يَصْلُحْ لَهَا اَنْ يُّرٰى مِنْهَا اِلاَّ هٰذَا وَهٰذَا، وَاَشَارَ اِلٰى وَجْهِهٖ وَكَفَّيْهِ ـ

৩৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আসমা বিনত আবূ বকর (রা) একদা পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় মহানবীর ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি বললেন, হে আসমা! মহিলাদের যে দিন থেকে মাসিক হওয়া শুরু করে সে দিন থেকে তাদের এই এই অঙ্গ ছাড়া কিছুই দেখানো ঠিক নয়। এই বলে তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জিদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

(আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৭)

পবিত্রতা বিষয়ক

৩৯. আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ অপবিত্র (জুনুবী) অবস্থায় নিদ্রা যেতে ইচ্ছা করলে তিনি তার যৌনাঙ্গ ধুয়ে নিতেন এবং সালাতের অযূর ন্যায় অযূ করতেন।

৪০. খুল্লাস আল-হাজরী (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : ঋতুস্রাব অবস্থায় আমি ও নবী ﷺ একই চাদরের নিচে ঘুমিয়েছি। নবী ﷺ-এর শরীরে বা কাপড়ে রক্ত লাগলে তিনি তা ধুয়ে সালাত পড়তেন"। (আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪)

٤١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ ـ

৪১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ গোসলের পর আর অযূ করতেন না। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯ ও নাসাঈ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯)

٤٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلسِّوَاكُ مُطْهِرَةٌ لِّلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِّلرَّبِّ ـ

৪২. আয়েশা (রা) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মিসওয়াক মুখ পবিত্র করে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আনয়ন করে। (সুনানে আন-নাসাঈ)

٤٣. عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهٖ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلَاةِ وَ لَمْ يَتَوَضَّاْ قُلْتُ : مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتِ فَضَحِكَتْ ـ

৪৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন স্ত্রীকে চুমু দিতেন। তারপর নতুন অযূ ছাড়াই সালাতে যেতেন। উরওয়া (রা) বলেন, তিনি আর কেউ নন আপনি ছাড়া। এ কথা শুনে তিনি হাসলেন। (ইবনে মাজাহ, পৃ. ৩৮)

٤٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِذَا الْتَقَى الْخَتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَعَلْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَغَسَلْنَا ـ

৪৪. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন দুই লজ্জাস্থান মিলিত হয় তখন গোসল ফরয হয়ে যায়। আমার এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমনটি হতো। অতঃপর আমরা গোসল করে নিতাম। (বুখারী)

ইবাদতমূলক

٤٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فِىْ غَلَسٍ فَيَنْصَرِفْنَ نِسَاءُ الْمُؤْمِنِيْنَ لاَ يُتَعَرَّفْنَ مِنَ الْغَلَسِ اَوْ لاَ يَعْرِفْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا ـ

৪৫. আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত অন্ধকার থাকতে পড়তেন। মু'মিন মহিলাগণ সালাত শেষে ফিরে আসতেন, অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেতো না বা তাঁরা একে অপরকে চিনতে পারতো না।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০)

٤٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ اِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ ـ

৪৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের সালাম ফিরানোর পর اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلاَمُ وَ مِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَ الْاِكْرَامِ ـ পাঠ করা পরিমাণ সময় বসতেন।

(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৮)

٤٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ اَوْ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ فَقَدْ اَدْرَكَهَا ـ

৪৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাক'আত পেল, সে যেন পূর্ণ ফজর ও আসরের সালাতই পেল।

(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১)

٤٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اِذَا عَمِلَتِ الْعَمَلَ لَزِمَتْهُ ـ

৪৮. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী ﷺ বলেন : আল্লাহর নিকট উত্তম আমল হলো যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয়। আয়েশা (রা) যখন কোন আমল করতেন তখন তা স্থায়ীভাবে করতেন। (মুসলিম)

٤٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ بِهٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ : اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنٰى وَالْفَقْرِ .

৪৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ নিম্নের বাক্যগুলো দ্বারা দু'আ করতেন : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জাহান্নামের ফিতনা ও আযাব থেকে এবং ধনাঢ্য ও দারিদ্র্যতার অপকারিতা থেকে আশ্রয় চাই।

(আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৫)

٥٠. عَنْ مُعَاذَةَ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ (رضى) اَتَجْزِىُ اِحْدَانَا صَلٰوتُهَا اِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَةٌ اَنْتِ كُنَّانَحِيْضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَيَاْمُرُنَا بِهِ اَوْ قَالَتْ فَلاَ نَفْعَلُهُ .

৫০. মু'আযা থেকে বর্ণিত যে, একটি মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল, মহিলারা হায়েজ থেকে পবিত্র হলে তাদের জন্য কী সালাতের কাজা আদায় করে দেয়া আবশ্যক? আয়েশা (রা) বললেন, তুমি কী খারেজী মহিলা? আমরাতো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জীবন কাটিয়েছি, আমাদেরও ঋতুস্রাব হত অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সালাত কাজা করার জন্য কখনো বলেননি তাই আমরা কোন দিন কাজা আদায় করতাম না। (বুখারী)

٥١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَاُ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا كَبَّرَ قَرَاَ جَالِسًا حَتّٰى اِذَا بَقِىَ عَلَيْهِ مِنَ السُّوْرَةِ ثَلاَثُوْنَ اَوْ اَرْبَعُوْنَ اٰيَةً قَامَ فَقَرَاَ هُنَّ ثُمَّ رَكَعَ .

৫১. আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাত্রের সালাত বসে পড়তে দেখিনি। তবে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃদ্ধ হয়ে

গিয়েছিলেন তখন কেরাত পাঠ করার সময় বসে বসে পড়তেন। আর ত্রিশ চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতেই দাঁড়িয়ে যেতেন এবং তা পড়ে রুকু করতেন। (মুসলিম)

৫২. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ (رضى) قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ (رضى) عَنْ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَنْ تَطَوُّعِهِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ اَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِيْ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيْهِنَّ الْوِتْرَ وَكَانَ يُصَلِّيْ لَيْلاً طَوِيْلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيْلاً قَاعِدًا وَكَانَ اِذَا قَرَاَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَكَانَ اِذَا قَرَاَ قَاعِدًا رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ .

৫২. আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা) থেকে রাসূল করীম ﷺ-এর নফল সালাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আয়েশা (রা) বললেন, রাসূল করীম ﷺ জোহরের পূর্বে চার রাকা'আত আমার ঘরে পড়তেন, তারপর মসজিদে গিয়ে ফরজ আদায় করতেন। অতঃপর ঘরে চলে আসতেন এবং জোহরের পর দুই রাকাত পড়তেন। মাগরিবের সালাত শেষ করেও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকা'আত পড়তেন। এশার সালাতের পরও ঘরে চলে আসতেন এবং দুই রাকা'আত পড়তেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত বেতরসহ নয় রাকা'আত আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের সালাত কখনো দাঁড়িয়ে আর কখনো বসে বসে আদায় করতেন। দাঁড়িয়ে কেরাত পাঠ করলে রুকু সেজদাও দাঁড়িয়ে করতেন। আর বসে কেরাত পড়লে রুকু সেজদাও বসে আদায় করতেন। ফজর হয়ে গেলে দুই রাকা'আত আদায় করতেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা : পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের রাকা'আতের মোট সংখ্যা নিম্নরূপ :

সালাত	ফরজ	ফরজের পূর্বে সুন্নাত	ফরজের পরে সুন্নাত
ফজর	২	২	-
জোহর	৪	২ বা ৪	২
আছর	৪	-	-
মাগরিব	৩	-	২
এশা	৪	-	২
মোট	১৭	৪/৬	৬

٥٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ فِىْ اَوَّلِهٖ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَ اٰخِرَهٗ .

৫৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন : যখন তোমাদের কেউ খাবার শুরু করে সে যেন প্রথমে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। প্রথমে তা ভুলে গেলে পরে বলবে– بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَ اٰخِرَهٗ।

(বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২৯, তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭।)

পরকাল বিষয়ক

٥٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ : يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا .

৫৪. আয়েশা (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : হে আমার উম্মতগণ! আল্লাহর শপথ আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে, তবে তোমরা কম করে হাসতে, বেশি করে কাঁদতে। (বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৮১)

٥٥. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَنْ اَحَبَّ لِقَاءَ اللّٰهِ اَحَبَّ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللّٰهِ كَرِهَ اللّٰهُ لِقَاءَهٗ ـ

৫৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ পছন্দ করে আল্লাহও তাঁর সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎ অপছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ অপছন্দ করেন।

(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৩)

٥٦. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ يَقُوْلُ : يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا ؟

৫৬. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন : কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষকে উলঙ্গ অবস্থায় এবং খাতনা বিহীন একত্রিত করা হবে। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম : হে রাসূল ﷺ পুরুষ ও নারী সকলকেই কি এভাবে একত্রিত করা হবে?

٥٧. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُبْكِيْكَ ؟ قَالَتْ : ذَكَرْتُ النَّارَ، فَبَكَيْتُ هَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ : اَمَا فِىْ ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ، فَلاَ يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا : عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ ـ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ : هَاؤُمُ اقْرَؤُوْا كِتَابِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهٗ اَ فِىْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِىْ شِمَالِهٖ اَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِىْ جَهَنَّمَ ـ

৫৭. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একদা জাহান্নামের আগুনের কথা স্মরণ করত: কাঁদছিলেন। মহানবী ﷺ বললেন : তোমাকে কাঁদাল কে? তিনি

বললেন, আমি জাহান্নামের আগুন স্মরণ করছিলাম, তাই কাঁদছি। আচ্ছা আপনি কি কিয়ামতের দিনে আপনার পরিবার-পরিজনদের কথা মনে রাখবেন? মহানবী ﷺ বললেন : এমন তিনটি স্থান রয়েছে যেখানে কেউ কাউকে মনে রাখবে না। ১. আমল ওজন করার সময়, যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হবে যে, তার ওজন ভারী হলো না হালকা হলো। ২. যখন আমলনামা দেয়া হবে এই বলে যে, এসো তোমার আমলনামা পড়ে দেখ। যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হবে তার আমলনামা ডান হাতে পাচ্ছে, না বাম হাতে, নাকি পৃষ্ঠদেশে। ৩. জাহান্নামের উপরে রাখা কঠিন (পুলসিরাত) পার হবার সময়। (আবূ দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪৫-৪৫)

٥٨. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ : (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا صَفِيَّةُ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا فَاطِمَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْئًا ، سَلُوْنِىْ مِنْ مَالِىْ مَا شِئْتُمْ ـ

৫৮. আয়েশা (রা) বলেন, যখন আল্লাহর এ বাণী নাযিল হলো "তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : হে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা সাফিয়া! হে মুহাম্মদ তনয়া ফাতিমা! হে বনূ আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর বিষয়ে তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারবো না, তোমরা আমার মাল থেকে যা খুশি চেয়ে নিতে পার। (তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬)

٥٩. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ـ

৫৯. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : জন্মগত সম্বন্ধের কারণে যা হারাম হয়, দুধ পানগত সম্বন্ধের কারণেও তা হারাম হয়। (মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৬)

৬০. আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন : এক-চতুর্থাংশ দীনার বা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মূল্যের সম্পদ চুরি করলে চোরের হাত কেটে দিতে হবে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩)

٦١. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلاَتِهٖ فَيَأْخُذْ بِاَنْفِهٖ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

৬১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কারো সালাতে অযূ ছুটে গেলে (হদস) সে যেন তাঁর নাক ধরে পিছনে চলে আসে। (আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৯)

٦٢. عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ (رض) اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ (رضى) هَلْ لِلنِّسَاءِ اَنْ يُصَلِّيْنَ عَلَى الدَّوَابِّ ؟ قَالَتْ لَمْ يُرْخَصْ لَهُنَّ فِىْ ذٰلِكَ، فِىْ شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ.

৬২. আতা ইবন আবী রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদের সাওয়ারীর উপর সালাত আদায় করার অনুমতি আছে কি? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে কোন অনুমতি নেই। স্বাভাবিক অবস্থাতেও নয় এবং অস্বাভাবিক অবস্থাতেও নয়। (মুসলিম, পৃ. ১৭৩)

٦٣. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

৬৩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : কেউ যদি রোযা কাযা থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তার অভিভাবকদের কেউ তা আদায় করে দেবে। (আবূ দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৬)

٦٤. عَنْ عَائِشَةَ (رضى) قَالَتْ : اِنَّمَا نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ لُحُوْمِ الْاَضَاحِىْ لِجُهْدِ النَّاسِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيْهَا.

৬৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, কুরবানীর গোশত সংরক্ষণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছিলেন জনগণের অভাব-অনটনের কারণে। এ অবস্থা উত্তরণের পর তিনি তা পুনরায় সংরক্ষণের অনুমতি দান করেন।

(ইবনে মাজাহ, পৃ. ২২৮)

অন্যান্য বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অবদান

আয়েশা (রা) ইসলামী সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে এক বিস্ময়কর নাম। হাদীস ছাড়াও তাফসীর, ফিক্‌হ, সাহিত্য, কাব্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি শারঈ ও পার্থিব বিষয়ে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো।

তাফসীর বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অবদান : পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে পরিভাষায় তাফসীর বলে। এ ক্ষেত্রেও আয়েশা (রা)-এর অবদান ছিল অসামান্য। দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সাহচর্য থেকে তিনি কুরআন অবতরণ, নাযিলের প্রেক্ষাপট এবং এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। উপরন্তু তাঁর ঘরেই অধিকাংশ সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কুরআনের আয়াত নাযিল হতো। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন (ভাব ও তাৎপর্যসহ) শিক্ষা লাভ করতেন। আবূ ইউনূস নামে তাঁর এক দাসকে দিয়ে তিনি কুরআন লিখিয়েছিলেন। তাঁর বর্ণনায় আল-কুরআনের অনেক আয়াতের সঠিক তত্ত্ব ও তাৎপর্য প্রতিভাত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো–

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী–

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। সুতরাং যারা বায়তুল্লাহর হজ্জ বা উমরা করবে তাদের জন্য এ দু'টির তাওয়াক (সাঈ) করাতে কোন দোষ নেই"।

এ আয়াত সম্পর্কে একদা তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ও ভাগ্নে উরওয়া (র) বললেন : খালা আম্মা! অত্র আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, সাফা, মারওয়ার তাওয়াফ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। আয়েশা (রা) বললেন : "তোমার ব্যাখ্যা সঠিক নয়, যদি আয়াতটির অর্থ তাই হতো, তবে আল্লাহ এভাবে বলতেন : لاَ جُنَاحَ اَنْ لاَّ يَطَّوَّفَ অর্থাৎ ঐ দু'টির তাওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই। মূলত এ আয়াতটি আনসারদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা ইসলামে দীক্ষিত হবার পূর্বে মানাত দেবীর অর্চনা করত। এ

মূর্তি ছিল কুদায়দ সংলগ্ন মুশাল্লাল পর্বতে। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে অত্র আয়াত নাযিল হয়। অতঃপর আয়েশা (রা) বলেন : "নবী ﷺ সাফা ও মারওয়ায় সাঈ করেছেন। সুতরাং এখন তা পরিত্যাগ করার অধিকার কারো নেই।"

২. আল্লাহ তা'আল্লার বাণী–

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطٰى

"তোমরা সকল সালাতের ব্যাপারে যত্নবান হও, বিশেষত মধ্যবর্তী সালাতের"। এখানে মধ্যবর্তী সালাত নিয়ে সাহাবীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যায়িদ ইবন সাবিত এবং উসামা (রা)-এর মতে, এর দ্বারা যুহরের সালাত, আবার কোন কোন সাহাবীর মধ্যে ফজরের সালাতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু আয়েশা (রা) আয়াতটির ব্যাখ্যায় বলেছেন : তা হলো আসরের সালাত। তিনি এ তাফসীরের ওপর এত দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে, স্বীয় মাসহাফের পাদটীকায় وَصَلَاةُ الْعَصْرِ কথাটি লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তাঁর মাসহাফ লেখক আবূ ইউনুস বলেন : " তিনি আমাকে তাঁর নিজের জন্য কুরআন লিখার নির্দেশ দিয়ে বললেন : যখন এ আয়াত পর্যন্ত আসবে তখন আমাকে জানাবে। আমি তাঁকে সে সম্পর্কে জানালে তিনি বললেন : الصَّلَاةُ الْوُسْطٰى এর পরে صَلَاةُ الْعَصْرِ কথাটি লিখে দাও। অতঃপর তিনি বলেন, আমি মহানবী ﷺ-এর থেকে এর ব্যাখ্যা এমনই শুনেছি।

৩. আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : "তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছে তার হিসাব নিবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করবেন"। এ আয়াত সম্বন্ধে ইবন আব্বাস ও আলী (রা) বলেন : "অত্র আয়াতের বিধান মতে, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে"। আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর দ্বারা রহিত হয়ে গিয়েছে। ইবন উমর (রা)-এর অভিমতও অনুরূপ। জনৈক ব্যক্তি আয়েশা (রা)-এর নিকট উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলে তিনি "যে খারাপ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে" আয়াতটি উল্লেখ করেন।

প্রশ্নকারীর বক্তব্য ছিল এই যদি অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ বান্দা কি করে লাভ করবে? আয়েশা (রা) বললেন : নবী ﷺ-এর নিকট আমি এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন সর্বপ্রথম তুমিই এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করেছ। আল্লাহর কালাম সত্য। তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ছোট ছোট অপরাধসমূহ বিভিন্ন মুসিবত-বিপদের মাধ্যমে ক্ষমা করে দেন। কোন মু'মিন যখন রোগাক্রান্ত হয় বা তার উপর বিপদ নেমে আসে, এমনকি পকেটে কোন জিনিস রেখে ভুলে যায়, আর তা অন্বেষণ করতে করতে অস্থির হয়ে পড়ে, এ সবই তাঁর ক্ষমা ও অনুকম্পা লাভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর অবস্থা এমন হয় যে, সোনা আগুনে জ্বালালে যেমন নিখাঁদ হয়ে যায়, তেমনি মু'মিন ব্যক্তিও গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

৪. আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা যার কাছে থেকে হিসাব চেয়ে বসবেন সে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বললাম : হে রাসূল ﷺ অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا "অচিরেই তাদের থেকে সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে"। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এর অর্থ হল اَلْعَرْضُ। অর্থাৎ আমলনামা উপস্থাপনা।

ফিকহ বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অবদান : কুরআন ও হাদীসের উপর ভিত্তি করে শরঈ বিষয়ে যে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে তাকেই ফিকহ বলে। এই ফিকহ শাস্ত্রে আয়েশা (রা)-এর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহানবী ﷺ ছিলেন সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও ফতওয়া দানের কেন্দ্রস্থল। তাঁর ইন্তিকালের পর ইসলামী শরী'আত ও হুকুম-আহকামে পারদর্মী সাহাবীদের উপর এ দায়িত্ব বর্তায়। বিশেষ কোন সমস্যা আসলে তাঁরা প্রথমে কুরআন ও সুন্নায় তার সমাধান তালাশ করতেন। কিন্তু তাতে স্পষ্ট সমাধান না পেলে কুরআন ও হাদীসের অন্য হুকুমের উপর কিয়াস বা অনুমান করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। খুলাফায়ে রাশিদার যুগের শেষ পর্যায়ে এসে বিভিন্ন কারণে বড় বড় সাহাবীদের অনেকেই মক্কা, তায়িফ, দামিস্ক, বসরা, কূফা প্রভৃতি নগরীতে ছড়িয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, আবূ হুরায়রা ও আয়েশা (রা)-এ চার মহান ব্যক্তিত্ব মদীনায় ফিকহ ও ফতওয়ার কাজ আঞ্জাম দেন।

এ ক্ষেত্রে ইবনে ওমর ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর পদ্ধতি ছিল উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের কোন বিধান কিংবা পূর্ববর্তী খলীফাদের কোন আমলে থাকলে তাঁরা তা বলে দিতেন। অন্যথায় নীরবতা অবলম্বন করতেন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) এ ক্ষেত্রে কুরআন, সুন্নাহ ও পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলে সমাধানকৃত মাসআলার ওপর অনুমান করে নিজের জ্ঞান ও বৃদ্ধি অনুযায়ী সমাধান দিতেন। এ ক্ষেত্রে আয়েশা (রা)-এর মূলনীতি ছিল প্রথমে কুরআন ও পরে সুন্নাতের মাঝে সমাধান অনুসন্ধান করা। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে সমাধান না পেলে স্বীয় জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করা। নিম্নে তাঁর গৃহীত ফিকহী মাসআলার কিছু উদাহরণ পেশ করা হলো–

* আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ.

"তালাক প্রাপ্তা নারী তিন 'কুরূ' পর্যন্ত নিজেকে অপেক্ষায় রাখবে। অর্থাৎ এ সময় পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে।" (সূরা আল বাকারা : আয়াত-২২৮)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর এক ভাতিজী স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হন। তাঁর ইদ্দতের তিন তুহুর অর্থাৎ পবিত্রতার তিনটি মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে নতুন মাসের প্রারম্ভনায় আয়েশা (রা) তাকে স্বামী গৃহ ছেড়ে চলে আসতে বলেন। কিছু লোক এটাকে কুরআনী হুকুমের পরিপন্থী বলে প্রতিবাদ জানায়। তাঁরা দলীল হিসেবে উল্লেখিত আয়াতটি পেশ করলে আয়েশা (রা) বলেন : আল্লাহর বাণী সত্য। 'কুরূ' এর অর্থ কি তা কি তোমরা জান? 'কুরূ' অর্থ : পবিত্রতা (তুহুর)। মদীনার ফিকহবিদগণ এ বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর অনুসরণ করেছেন। তবে ইরাকের ফকীহগণ 'কুরূ' বলতে হায়েজ (ঋতুস্রাব)-কে বুঝে থাকেন।

* স্বামী স্ত্রীকে তালাক দানের ক্ষমতা অর্পণ করলে এবং স্ত্রী সে ক্ষমতা স্বামীকে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে সর্বোতভাবে মেনে নিলেও কি সে স্ত্রীর ওপর কোন তালাক পতিত হবে? এ ক্ষেত্রে আলী (রা) ও যায়েদের (রা) অভিমত হলো স্ত্রীর ওপর এক তালাক প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আয়েশা (রা)-এর মতে কোন তালাকই হবে না। তিনি তাঁর মতের স্বপক্ষে 'তাখঈর' এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন : রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদেরকে এ ইখতিয়ার বা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে ছেড়ে পার্থিব সুখ-সাচ্ছন্দ গ্রহণ করতে পারেন, অথবা তাঁর সাথে থেকে এ

দারিদ্র্যময় জীবন বেছে নিতে পারেন। উম্মুল মু'মিনীনগণ (রা) শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেন। অথচ এতে তাঁদের ওপর কোনরূপ তালাক পতিত হয়নি।

এরূপ আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে, যাতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আয়েশা (রা)-এর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গী বা ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও সূক্ষ্মতার প্রমাণ মিলে।

আরবী সাহিত্যে আয়েশা (রা)-এর অবদান : আরবী ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। এ ভাষা অত্যন্ত অলংকার সমৃদ্ধ, ছন্দময় ও প্রাঞ্জল। আয়েশা (রা) তাঁর এ মাতৃভাষার ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এর পশ্চাতে অলংকার সমৃদ্ধ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস চর্চা ও অধ্যয়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল বলে অনুমিত হয়। আয়েশা (রা) অত্যন্ত সুমিষ্ট, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর ছাত্র মূসা ইবন তালহা এ সম্পর্কে যথার্থ বলেন : مَا رَأَيْتُ أَفْصَحَ مِنْ عَائِشَةَ "আমি আয়েশা (রা) অপেক্ষা অধিকতর অলংকারময় ও প্রাঞ্জলভাষী কাউকে দেখিনি"। আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত অসংখ্য হাদীসের মধ্যে অনেক হাদীস তিনি নিজের প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে শৈল্পিকরূপ ও সৌন্দর্য। তাতে বিভিন্ন রূপক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার সার্থক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ওহী অবতীর্ণের বর্ণনা উল্লেখ করা যায়। আয়েশা (রা) বলেন :

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِى النَّوْمِ، فَكَانَ لاَ يَرٰى رُؤْيًا اِلاَّ جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ

"প্রথমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর ওহী নাযিল হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা ভোরের স্বচ্ছ ঊষার ন্যায় তাঁর কাছে দীপ্যমান হতো"।

সাহিত্যিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সত্য স্বপ্নসমূহকে সাহিত্যের উচ্চাঙ্গ ভঙ্গীমায় "প্রত্যুষের কিরণের" সাথে তুলনা করেছেন।

অনুরূপ তাঁর ওপর ইফক বা মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনার সময়কার এক রাতের করুণ চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন–

فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ
حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْقَى لِي دَمْعٌ
وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ

"ঐ রাতটি ক্রন্দন করে কাটালাম।
সকাল পর্যন্ত আমার অশ্রুও শুকায়নি
এবং আমি চোখে ঘুমের সুরমাও লাগাইনি"।

অর্থাৎ তিনি ঐ রাতটি জেগে কেঁদে কেঁদে অতিবাহিত করেছেন, এ কথাটি তিনি সরল বাক্যে না বলে অলংকার সমৃদ্ধ অভিব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ভাষার ওপর তাঁর যে যথেষ্ট দখল রয়েছে এতে তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

আয়েশা (রা) ছিলেন অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতী ও সূক্ষ্মদর্শিনী মহিলা। প্রাচীন আরবের লোক সাহিত্যের ওপর তাঁর বিচরণ ছিল। আরবের এগার সহোদরের একটি লম্বা কিচ্ছা তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ একাগ্রচিত্তে তাঁর বর্ণনা শুনতেন। এসব কাহিনী বর্ণনাতে তার ভাষার লালিত্য, অনন্য বাচনভঙ্গি, অসাধারণ গাঁথুনী ও আরবী সাহিত্যে তাঁর অগাধ নৈপুণ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

পত্র সাহিত্যে আয়েশা (রা) : যে কোন ভাষায়ই পত্র সাহিত্যের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামী সাহিত্য কিংবা আরবী সাহিত্য এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন অসংখ্য পণ্ডিতের নাম পাওয়া যাবে যাদের পত্রাবলী ইসলামী সাহিত্যকে সমধিক সমৃদ্ধ করেছে। তন্মধ্যে আয়েশা (রা)-এর নাম শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতে পারি। আয়েশা (রা) ছিলেন তৎকালীন সময়ের শরয়ী বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ইসলামী রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদল বা জ্ঞানপিপাসুগণ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজনের তাগিদে অনেক সময় আয়েশা (রা) কেও বিভিন্ন শহর বা অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সাথে পত্র যোগাযোগ করতে হয়েছে। লিখনী বিদ্যার সাথে তাঁর তেমন পরিচয় না থাকলেও অন্যের মাধ্যমে তিনি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো লিখে নিতেন।

কিন্তু এসব ক্ষেত্রে তাঁর পত্রের ভাব ও ভাষা ছিল একান্তই নিজস্ব। তাঁর পত্রাবলিতেও সাহিত্যের প্রবীণ সাহিত্যিকগণ সাহিত্যমূল্য বিবেচনা করে নিজেদের রচনাবলীতে স্থান দিতে আগ্রহী হয়েছেন। ইবন আবদি রাব্বিহি রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আল-ইক্বদুল ফরীদ এর ৪র্থ খণ্ডে আয়েশা (রা)-এর অনেক পত্র সঙ্কলিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নিম্নে একটি পত্রের উল্লেখ করা হলো–

আয়েশা (রা) বসরায় পৌঁছে তথাকার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব যায়েদ ইবন সূহানকে পত্র লিখেছেন এভাবে–

مِنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى ابْنِهِ الْخَالِصِ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ أَبَاكَ كَانَ رَأْسًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَسَيِّدًا فِي الْإِسْلَامِ وَإِنَّكَ مِنْ أَبِيْكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُصَلِّيْ مِنَ السَّابِقِ يُقَالُ : كَانَ أَوْ لَحِقَ وَقَدْ بَلَغَكَ الَّذِيْ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ مَصَابِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَنَحْنُ قَادِمُوْنَ عَلَيْكَ وَ الْعَيَانِ أَشْفَى لَكَ مِنَ الْخَبَرِ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِيْ هٰذَا فَثَبِّطِ النَّاسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وَالسَّلَامُ ـ

"মু'মিনদের জননী আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর একনিষ্ঠ সন্তান যায়েদ ইবন সুহানের প্রতি লিখিত। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর কথা এই যে, তোমার পিতা জাহিলী যুগে সর্দার ছিলেন। ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরও তিনি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন ছিলেন। তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে মাসবুক মুসল্লীর অবস্থানে আছ, যাকে বলা যায় প্রায় কিংবা সুনিশ্চিতভাবে লাহিক হয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি অবগত আছ যে, খলিফা ওসমান ইবনে আফফান (রা) হত্যার মাধ্যমে ইসলামে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এসেছি তোমার কাছে, প্রত্যক্ষ দেখা সংবাদের চেয়ে তোমায় অধিক স্বস্তি দেবে। তোমার কাছে আমার এ পত্র পৌঁছানোর পর মানুষকে আলী ইবন আবু তালিব (রা)-এর পক্ষাবলম্বন থেকে বিরত রাখবে। তুমি স্বগৃহে অবস্থান করতে থাকো, যতক্ষণ না আমার পরবর্তী নির্দেশ তুমি পাও। ওয়াস সালাম।"

কাব্য সাহিত্যে আয়েশা (রা)-এর অবদান : আরব জাতি কাব্য কবিতার সাথে অধিক পরিচিত ছিল। স্বভাবতই তারা ছিল কাব্য প্রিয়। কাব্য ও নারী ছিল তাদের সকল কাজের জীবনী শক্তি। জাহেলী যুগ থেকেই আরবরা কাব্য চর্চায় অভ্যস্ত ছিল। ওকায মেলায় প্রতিবছর উন্মুক্ত কাব্য প্রতিযোগিতা হতো। কারো সম্মান মর্যাদা বর্ণনা বা কারো কুৎসা বা নিন্দা রটনার প্রধান হাতিয়ার ছিল কবিতা। জাহেলী যুগে আরবের কোন কবির স্থান বা মর্যাদার উল্লেখ করতে যেয়ে ইবন রাশীক আল-কায়রোয়ানী বলেন : "আরবের কোন কবি গোত্রের একজন কবি কাব্য জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে অন্যান্য গোত্র কর্তৃক অভিনন্দিত হতো। বিয়ের অনুষ্ঠানের পর মেয়েরা বাদ্য বাজিয়ে ফূর্তি করত। নানা রকম খাদ্যের আয়োজন করা হতো। আবাল, বৃদ্ধা, বণিতা সবাই মিলে উল্লাস করত। কারণ তাদের মতে, একজন কবি হলো মান মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক এবং সুনাম-সুখ্যাতির প্রসারক"।

ইসলাম আগমনের পরও আরবদের মাঝে কাব্যচর্চার এ শাণিতধারা ব্যাপকভাবে অব্যাহত থাকে। তাদের অনেকেই কাব্যচর্চায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। ইবন কুতায়বা-এর ভাষায়–

اَلشُّعَرَاءُ الْمَعْرُوْفُوْنَ بِالشِّعْرِ عِنْدَ عَشَائِرِ هِمْ وَقَبَائِلِهِمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَالْاِسْلَامِ اَكْثَرُ مِنْ اَنْ تُحِيْطَ بِهِمْ مُّحِيْطٌ.

অর্থাৎ, জাহিলী ও ইসলামী যুগে যারা কবিতার জন্য তাদের সমাজ ও গোত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের সংখ্যা এক অধিক যে, কেউ তা গণনা করতে পারবে না।"

আনাস ইবন মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আমাদের নিকট (মদীনায়) আসেন, আনসারদের প্রতিটি গৃহে তখন কাব্য চর্চা হতো। পুরুষদের পাশাপাশি আরবের মেয়েরাও কাব্য চর্চা করতো।

উম্মুল মু'মিনূন আয়েশা (রা) তাঁর প্রথম স্মৃতিশক্তিকে কুরআন ও হাদীস চর্চার পাশাপাশি কাব্য চর্চা ও তা সংরক্ষণের কাজে লাগিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারেও কাব্য চর্চা হতো। আবূ বকর (রা) নিজেও একজন কবি ছিলেন। আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় আগমন করলেন, আবূ বকর (রা) ও বিলাল (রা) মদীনায় এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের উভয়ের নিকট গিয়ে বললাম, আব্বাজান! আপনার কেমন লাগছে? হে বিলাল (রা)! আপনার কেমন অনুভূত হচ্ছে? আয়েশা (রা) বলেন : আবূ বকর (রা) জ্বরে আক্রান্ত হলে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করতেন–

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهِ * وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

"প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিজনের মাঝে দিনাতিপাত করছে, অথচ মৃত্যু তার জুতার ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী"।

পিতার কাছ থেকেই তিনি কাব্য বিষয়ের বিভিন্ন জ্ঞান তথা এর আঙ্গিক চিত্রকল্প, ছন্দ, লালিত্য, ভাব-ভাষা প্রভৃতি শিখে নিয়েছেন এবং পরবর্তীতে তিনি এ বিষয়ে বুৎপত্তি অর্জনেও সক্ষম হয়েছিলেন। মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদের নিম্নের উক্তি তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি বলেন :

مَا كُنْتُ اَعْلَمُ اَحَدًا فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلاَ فَرِيْضَةً مِّنْ عَائِشَةَ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীদের মধ্যে কবিতা ও ফারাইয বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর থেকে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে জানি না"। তাঁর ভাগিনে উরওয়া ইবন যুবাইরও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ইসলাম পূর্ব ও পরবর্তী যুগে কবিদের অনেক কবিতা আয়েশা (রা)-এর মুখস্থ ছিল। তিনি সে সকল কবিতার অংশ বিশেষ বিভিন্ন সময় উদ্ধৃতি আকারে পেশ করতেন। হাদীসের গ্রন্থাবলিতে তাঁর বর্ণিত কিছু কবিতা বা পংক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়।

আয়েশা (রা) এর মাঝে কাব্য রস আস্বাদনের প্রবল আগ্রহ ছিল। অনেক কবি তাদের স্বরচিত কবিতা তাঁকে শুনাতেন। হাসসান ইবন সাবিত (রা) ছিলেন আনসারদের সেরা কবি। ইফকের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার কারণে তাঁর প্রতি আয়েশা (রা) এর মনোভাব তিক্ত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি আয়েশা (রা)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কবিতা শুনাতেন। হাসসান ইবন

সাবিত (রা) ছিলেন আনসারদের সেরা কবি। হাস্সান (রা) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সভা কবি। আয়েশা (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন : হাসসান! যতক্ষণ তুমি আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে কাব্যের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করতে থাকবে, জিব্রাইল আমীন (আ)-এর সাহায্য তুমি লাভ করবে। তিনি আরো বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, হাসসান তাদের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়ে দুশ্চিন্তা ও কষ্ট থেকে মুক্ত করেছেন। এসব কথা বর্ণনার পর আয়েশা (রা) হাসসান ইবন সাবিত (রা) এর নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃতি করেন–

١. هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجِبْتُ عَنْهُ * عِنْدَ اللّٰهِ فِيْ ذٰلِكَ الْجَزَاءُ

٢. هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بِرًّا حَنِيْفًا * رَسُوْلُ اللّٰهِ شِيْمَتُهُ الْوَفَاءُ

٣. فَإِنَّ أَبِيْ وَوَالِدُهُ وَعِرْضِيْ * لِعَرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

٤. فَمَنْ يَهْجُوْ رَسُوْلَ اللّٰهِ مِنْكُمْ * وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءُ

٥. وَ جِبْرَيِلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ فِيْنَا * وَ رُوْحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ.

১. "তুমি মুহাম্মদ ﷺ-এর কুৎসা রটনা করেছ, আমি তার জবাব দিয়েছি। আমার এ কাজের পুরস্কার রয়েছে আল্লাহর সমীপে।

২. তুমি মুহাম্মদের নিন্দা করেছ। অথচ তিনি নেককার, ধার্মিক ও আল্লাহর রাসূল। প্রতিশ্রুতি পালন যার চারিত্রিক ভূষণ।

৩. আমার পিতা-পিতাসহ, আমার মান-সম্মান সবই তোমাদের আক্রমণের হাত হতে মুহাম্মদের মান-সম্মান রক্ষার জন্য ঢালস্বরূপ।

৪. তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মুহাম্মদের কুৎসা, প্রশংসা বা সহায়তা করুক না কেন, সবই তার জন্য সমান।

৫. আল্লাহর বার্তাবাহক ও পবিত্র আত্মা জিব্রাঈল আমাদের মধ্যে আছেন, যার সমকক্ষ কেউ নেই।

তৃতীয় খলীফা উসমান (রা)-এর শাহাদাত বরণকে কেন্দ্র করে মদীনায় গোলযোগ সৃষ্টি হলে আয়েশা (রা) তা অবহিত হয়ে নিম্নের কাব্য চরণটি আবৃত্তি করেন–

وَلَوْاَنَّ قَوْمِىْ طَاعَتْنِىْ سَرَّاتُهُمْ * لَاَنْقَذْتُهُمْ مِّنَ الْحِبَالِ وَ الْخَبَلِ -

"যদি আমার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ আমার কথা মানতো তবে আমি তাদের এ ফাঁদ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারতাম।"

আয়েশা (রা) নিজে যেমন কবিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন, তেমনি অন্যদের গঠনমূলক কবিতা চর্চা ও অনুশীলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলেন–

حَسَنٌ وَّ مِنْهُ قَبِيْحٌ، خُذْ بِالْحَسَنِ وَدَعِ الْقَبِيْحَ مِنْهُ الشِّعْرُ -

কিছু কবিতা ভালো আছে, আবার কিছু খারাপও আছে, তোমরা খারাপটি ছেড়ে দিয়ে ভালোটি গ্রহণ কর"।

আয়েশা (রা) আরো বলেন : رَوُّوْا اَوْلَادَكُمُ الشِّعْرَ تَعْذَبُ اَلْسِنَتُهُمْ

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে কবিতা শিখাও। তা হলে তাদের ভাষা সুমধুর ও লাবণ্যময় হবে"।

এছাড়াও চিকিৎসা, ইতিহাস, কালাম শাস্ত্র, বিবাদমান সমস্যা ও প্রভৃতি বিষয়েও আয়েশা (রা)-এর কম-বেশি দখল ছিল।

মোটকথা উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ছিলেন উম্মতে মুহাম্মদিয়ার কাছে একটি নাম, একটি ইতিহাস ও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাদীস বিষয়ে তাঁর অনবদ্য অবদান মুসলিম উম্মাহ চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। মহিলাবিষয়ক অনেক শারঈ বিধান মুসলিম নারী সমাজ আয়েশা (রা)-এর মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, প্রখর মেধা ও মনন এবং অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতা হাদীস সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল অবদান সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন কল্পে বিস্তৃতভাবে ও স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্যে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

ওফাত : আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ৫৮ হিজরীতে ১৭ রমযান ৬৮ বছর বয়সে আয়েশা (রা) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ওছিয়ত মোতাবেক রাতের বেলা তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর আবূ হুরায়রা (রা) তাঁর সালাতে জানাযা পড়ান। আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়ের ও ওরওয়াহ বিন জুবায়ের দুই সহোদর জানাযার পর তাঁর লাশ কবরে নামান।

আয়েশা (রা)-এর মৃত্যু সংবাদে ঐ রাতের বেলায়ও পুরুষ ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে মহিলার সমাগম ঘটে। তাঁর মৃত্যু সংবাদ সকলকে এত ব্যথাতুর করেছিল যে, মাসরুক বলেন, 'নিষিদ্ধ না হলে আমি উম্মুল মু'মিনীনের জন্য মাতমের আয়োজন করতাম।' আর আবূ আইউব আনসারী বলেন, 'আমরা আজ মাতৃহারা শিশুর মতো এতিম হলাম।'

৪. উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)

'মা হাফসা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সমানে সমানে উত্তর দিয়ে থাক? হাফসা বললেন, হ্যাঁ, অনেক সময় তাই হয়। আমি বললাম, খবরদার! কখনো এরূপ করবে না। তুমি মনে কর না যে, তোমার রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুগ্ধ করেছে, বরং তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে।'

উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) জান্নাতী।

عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ جِبْرِيْلُ رَاجِعْ حَفْصَةَ فَاِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ وَاِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِى الْجَنَّةِ .

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন : জিবরীল আমাকে বলেছে যে, আপনি হাফসা (রা) থেকে প্রত্যাবর্তন করুন, কেননা সে অধিক রোযাদার ও অধিক নফল সালাত আদায়কারী এবং সে জান্নাতে আপনার স্ত্রী।

(হাকেম : সহীহ্ আল জামে আস্‌সাগীর লি আলবানী, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং-৪৭২৭)

ওমর (রা)-এর উক্তি : মা হাফসা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সমানে সমানে উত্তর দিয়ে থাক? হাফসা বললেন, হ্যাঁ, অনেক সময় তাই হয়। আমি বললাম, খবরদার! কখনো এরূপ করবে না। তুমি মনে কর না যে, তোমার রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুগ্ধ করেছে, বরং তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে।

নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম হাফসা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর পিতা ছিলেন। মায়ের নাম যয়নব বিনতে মাযউন। তাঁর বংশ তালিকা হাফসা বিনতে ওমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল

ওযযা ইবনে রিবাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কুরাত ইবনে রিযাহ্ ইবনে আদী ইবনে লুয়াই ইবনে ফিহির ইবনে মালিক।

জন্ম ও ইসলাম গ্রহণ : হাফসা (রা) নবুওয়্যাতের পাঁচ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এ সময় কোরাইশগণ কা'বাঘর পুন:নির্মাণ করছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ছিলেন তাঁর সহোদর। তিনি কবে, কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তা পরিষ্কার করে জানা যায় না। শুধু এতটুকু জানা যায় যে, ওমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রভাব সমগ্র পরিবারের ওপর পড়ে। ফলে তাঁর গোটা বংশের লোক ইসলাম কবুল করে। হাফসাও এ সময়ে পিতা-মাতা ও স্বামীসহ ইসলাম কবুল করেন।

প্রথম স্বামী : তাঁর স্বামী ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী খুনাইস ইবনে হুযাইফা ইবনে কায়েস ইবনে আদী। তিনি বনু সাহম বংশের লোক ছিলেন। মদীনায় হিজরতকালে স্বামী খুনাইস (রা)-এর সাথে হাফসা (রা)ও মদীনায় হিজরত করেন। পরবর্তীতে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হলে খুনাইস (রা) তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন।

বিধবা হয়ে পিতার গৃহে : তার স্বামী অল্প কয়েকদিন পর ইন্তেকাল করেন। সময়টা ছিল দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ রমযান। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা হাফসা (রা) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

মেয়ের বিবাহের জন্য ওমরের প্রস্তাব : হাফসা (রা) বিধবা হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর পিতা হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ওমর (রা) মেয়ের পুনরায় বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে চেষ্টা শুরু করেন। প্রথমে তিনি আবূ বকর সিদ্দিক (রা)-এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আবূ বকর (রা)-এর সাথে সরাসরি কথা বলেন। কিন্তু আবূ বকর (রা) কোন উত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ চুপ থাকেন। আবূ বকর (রা)-এর এ নীরবতা ওমর (রা) ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি। তাই ওসমান (রা)-এর নিকট তাঁর কন্যা হাফসাকে বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। এ সময়ে ওসমান (রা) বিপত্নীক ছিলেন। মানে তাঁর স্ত্রী নবী নন্দিনী রোকাইয়া (রা) কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তবুও ওসমান (রা)-এ প্রস্তাব এড়িয়ে গিয়ে জানিয়ে দেন যে আপাতত তিনি বিয়ের চিন্তা-ভাবনা করছেন না।

হাফসার স্বভাব : আসলে হাফসা (রা) ছিলেন রাগী মেজাজের মানুষ যা আবূ বকর (রা) বা ওসমান (রা)-এর মতো নরম স্বভাবের মানুষেরা পছন্দ করতেন না। যে কারণে তাঁরা উভয়েই ভদ্রভাবে বিষয়টা এড়িয়ে গেছেন। সকলের তো জানা– স্বয়ং ওমর (রা) নিজেই ছিলেন অসম্ভব কঠোর প্রকৃতির মানুষ। কথায় বলে না, 'বাপকা বেটা, সিপাহীকা ঘোড়া।' ঠিক তেমনি হাফছা (রা) ছিলেন 'বাপকা বেটি'। যা হোক হাফসা (রা)-কে বিয়ে করার ব্যাপারে আবূ বকর (রা) ও ওসমান (রা)-এর অনীহা ওমর (রা)-কে বেশ লজ্জায় ফেলেছিল। এ জন্য তিনি বিষয়টি সবিস্তারে রাসূল ﷺ-কে অবহিত করেন।

সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এ সেই ওমর (রা) যাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে জিবরাইল (আ) উপস্থিত হয়ে বললেন, 'মুহাম্মদ ﷺ! ওমরের ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছেন।' আর ইতোপূর্বে ইসলাম গ্রহণকারীরা তো খুশিতে ফেটে পড়লেন। কারণ তারা জানতেন, ওমরের ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে ইসলামের ইতিহাস ভিন্ন দিকে মোড় নিবে। সত্যিই তাই ওমর ইসলাম গ্রহণের পর পরই অন্য মুসলমানদেরকে নিয়ে কা'বায় গিয়ে সালাত আদায় করলেন– যা ছিল মুসলমানদের জন্য অভাবনীয় এবং বিস্ময়কর। কারণ ইতোপূর্বে ৪০/৫০ জন ইসলাম কবুল করলেও প্রকাশ্যে তাঁরা কা'বা ঘরে গিয়ে সালাত আদায় করার সাহস করেননি। ওমর (রা) এখানেই ক্ষান্ত হননি, তিনি আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের প্রধান শত্রু আবূ জেহেলের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবূ জেহেল বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি মনে করে?' আমি বললাম, 'আপনাকে এ কথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান বাণীকে মেনে নিয়েছি।' এ কথা শোনা মাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বলল, 'আল্লাহ তোকে কলঙ্কিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলঙ্কিত করুক।'

বুঝতেই পারছেন অবস্থা কি। মূলত এখান থেকেই ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। তারপর! তারপর তো কত ঘটনা, কত সংঘর্ষ-সংগ্রাম, কত বিজয়। আর এ জন্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ ওমর (রা) সম্পর্কে বলেছেন, 'ওমরের জিহ্বা ও অন্ত:করণে আল্লাহ তা'আলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে 'ফারুক'। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।

রাসূল ﷺ নিজেই প্রস্তাব দেন বিবাহের : মুহাম্মদ ﷺ সব দিক ভেবে চিন্তে ওমর (রা)-এর মর্ম বেদনার কথা উপলব্ধি করলেন এবং তাঁকে কন্যাদায়গ্রস্ততা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজেই হাফসাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। হিজরী তৃতীয় সনে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এতে করে ওমর (রা) যার পরনাই খুশি হন। অন্যদিকে একজন বিশিষ্ট শহীদ সাহাবীর নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রীর দুঃখময় নিঃসঙ্গ জীবনের অবসান ঘটে।

রাসূল ﷺ যখন হাফসা (রা)-কে বিয়ে করে ঘরে তুলে নিলেন, তখন একদিন আবূ বকর (রা) ওমর (রা)-এর সাথে দেখা করে বললেন, 'ওমর! যখন তুমি আমার নিকট হাফসার বিয়ের প্রস্তাব করেছিলে, তখন আমার নীরবতা তোমাকে ব্যথিত করেছিল। কিন্তু আমার নীরব থাকার কারণ ছিল এই যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হাফসা সম্পর্কে নিজেই আলোচনা করেছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই হাফসাকে স্বীয় পত্নীত্বে বরণ করে নেবেন। এ গোপন কথাটি আমি আর কারও নিকট প্রকাশ করিনি। যদি রাসূল ﷺ হাফসাকে বিয়ে না করতেন, তাহলে অবশ্যই আমি তাকে বিয়ে করতাম।'

হাফসাকে বিবাহ করার কারণ : ঐতিহাসিকদের মতে, রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-কে প্রধানত তিনটি কারণে বিয়ে করেছিলেন :

১. মুহাম্মদ ﷺ যে ইসলামের বিজয় নিশানকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেবেন তা তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহ তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করেছিলেন। ওমর (রা)-কে পুরস্কারস্বরূপ ও তাঁর মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য আল্লাহ্র রাসূল হাফসা (রা)-কে বিয়ে করেন এবং উভয়ের মধ্যকার আত্মীয়তার বন্ধনকে সুদৃঢ় করেন। শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর সাথে এ আত্মীয়তার বন্ধনের কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ ওমর (রা)-কে স্মরণ করবে। এটি একটি সুদূর প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদা।

২. হাফসা (রা)-কে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-এর মর্যাদাকে এত উচ্চে সমুন্নত করেছেন যে, শুধুমাত্র রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ে হওয়ার কারণে হাফসা (রা) মুহাম্মদ ﷺ-এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেন এবং সে নিশ্চয়তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদান করেছেন।

৩. আল্লাহর রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-কে বিয়ে করার মাধ্যমে ওমর (রা)-কে কন্যাদায়মুক্ত করেন এবং সকল প্রকার নিন্দার হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করেন।

রাসূলের সাথে হাফসার আচরণ : পূর্বেই জানিয়েছি যে, হাফসা (রা) একটু কড়া মেজাজের মানুষ ছিলেন। এমনকি তিনি অনেক সময় রাসূল ﷺ-এর সাথেও কথা কাটাকাটি করতেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে, 'একদা ওমর (রা) কোন একটি বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এমন সময় ওমরের স্ত্রী এসে বললেন, তুমি কি নিয়ে বেশি চিন্তা করছ? ওমর (রা) বললেন, আমার বিষয় সম্পর্কে খোঁজ নেবার অধিকার তুমি কোথায় পেলে? প্রত্যুত্তরে ওমরের স্ত্রী বললেন, তুমি আমার কথা পছন্দ কর না। কিন্তু তোমার মেয়ে হাফসা সমানে সমানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে প্রতিবাদ করে থাকে। ওমর (রা) বলেন, আমি তখনই হাফসার নিকট চলে আসলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা হাফসা! তুমি নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সমানে সমানে উত্তর দিয়ে থাক? হাফসা বললেন, হ্যাঁ, অনেক সময় তাই হয়। আমি বললাম, খবরদার! কখনো এরূপ করবে না। তুমি মনে কর না যে, তোমার রূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুগ্ধ করেছে, বরং তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিনয়ীভাব প্রকাশ করবে।

হাফসা (রা)-এর এ ধরনের আচরণের কারণে একবার তো রাসূল ﷺ তাঁকে এক তালাক পর্যন্ত দিয়ে বসেন। অবশ্য হাফসার রাতভর নফল ইবাদত ও দিনের বেলা রোযা রাখার কথা স্মরণ করিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল ﷺ-কে তাঁকে (হাফসাকে) গ্রহণ করে নেয়ার জন্য নির্দেশ দেন। রাসূল ﷺ আল্লাহ্র নির্দেশ মতো কাজ করেন।

হাফসার সাথে রাসূলের ভালোবাসা : এত কিছুর পরও রাসূল ﷺ হাফসাকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। অনেক গোপন কথাও তাঁকে বলতেন। একবার তিনি হাফসার সাথে একটি গোপন বিষয়ে আলাপ করেন এবং অন্য কারো কাছে না প্রকাশ করার জন্য বলেন। কিন্তু নারীসুলভ মানসিকতার কারণে তিনি তা আয়েশা (রা)-এর কাছে বলে দেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই রাসূল ﷺ হাফসা (রা)-এর ওপর রাগান্বিত হন। এরপর এ বিষয়কে কেন্দ্র করে সূরা তাহরীমে আল্লাহ ঘোষণা করেন–

وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِىُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ـ

অর্থ: 'আর রাসূল যখন তাঁর এক স্ত্রীর কাছে একটি গোপন কথা বলেন, আর তিনি তা ফাঁস করে দেন, আল্লাহ তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করলে তিনি বলেন, কে আপনাকে এটা বলে দিয়েছে? তিনি বললেন, যিনি মহাজ্ঞানী সর্বজ্ঞ, তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন।'

(সূরা তাহ্‌রীম : আয়াত-৩)

এ ঘটনাটিই হলো তাহ্‌রীমের ঘটনা। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যখন আয়েশা (রা) ও হাফসা (রা) একমত হয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়–

اِنْ تَتُوْبَا اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ـ

অর্থ : 'তোমরা উভয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করলে তা তোমাদের জন্য উত্তম। কেননা তোমাদের দিল সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে সরে গিয়েছে। আর তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহ্‌ই তো তাঁর প্রভু, জিবরাঈল এবং নেককার ঈমানদারগণ তো আছেই, এসবের পর আল্লাহ্‌র ফেরেশতারা তাঁর সহায়ক রয়েছেন।' [সূরা তাহ্‌রীম: আয়াত-৪]

মুনাফিকরা সব সময় তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য নানা ধরনের ফাঁক ফোকর খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এ আয়াতে ঐসব মুনাফিকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে, 'হাফসা আর আয়েশা যদি বিরোধ চায় আর মুনাফিকরা যদি ষড়যন্ত্র করে তা দিয়ে ফায়দা হাসিল করতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সাহায্য করবেন। আর আল্লাহ্ তার সাথে আছেন, জিবরাঈল ফেরেশতা এবং দুনিয়ার নেককার মু'মিনগণ।

আয়েশা ও হাফসার সাময়িক দ্বন্দ্ব : তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, 'একদা উম্মুল মু'মিনীন সাফিয়া (রা) কাঁদতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে হাফসা বলেছে যে, আমি ইয়াহূদীর মেয়ে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি নবী বংশের মেয়ে। তোমার বংশে বহু নবী আবির্ভূত হয়েছেন। বর্তমানে তুমি নবীর স্ত্রী। সুতরাং হাফসা তোমার ওপর কোন বিষয়ে গৌরব করতে পারে?'

আরো বর্ণিত আছে, 'একদিন আয়েশা ও হাফসা সাফিয়াকে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয় ও মর্যাদাশালীনী। আমরা তাঁর স্ত্রী এবং একই রক্তধারার অধিকারিণী। সাফিয়া এ কথায় ক্ষুণ্ণ হলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অভিযোগ পেশ করলেন। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি একথা কেন বলনি যে, তোমরা আমার চেয়ে অধিক সম্মানিতা কেমন করে হতে পার? আমার স্বামী স্বয়ং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ, আমার পিতা হারুন (আ) ও আমার চাচা মূসা (আ)।

আসলে হাফসা ও আয়েশা (রা)-এর মধ্যে খুবই মধুর সম্পর্ক ছিল। অনেক সময় তাঁরা একত্রে রাসূল ﷺ-এর সফর সঙ্গী হতেন।

ইতিহাস খ্যাত হবার কারণ : হাফসা (রা)-এর নাম যে কারণে ইতিহাসের পাতায় ও মু'মিনদের মনে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে লেখা হয়ে আছে তাহলো তিনি ছিলেন পবিত্র কুরআনের সংরক্ষক বা হেফাজতকারী। ইয়ামামার যুদ্ধে বহুসংখ্যক কারী ও কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন। 'আবূ বকর (রা)-এর খেলাফতকালে ১১ হিজরী সালে যিলহজ্জ মাসে ইয়ামামা নামক স্থানে কিছুসংখ্যক ধর্মত্যাগীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধে মুসলিম সেনাপতি ছিলেন খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা) এবং ধর্মত্যাগী সেনাপতি ছিল মুসায়লামা কাযযাব। এ যুদ্ধে এত বেশি সংখ্যক কুরআনের হাফেজ শহীদ হয়েছিলেন যে, এর ফলে মক্কা মদীনায় হাফেজের সংখ্যা অনেক কমে যায়। ওমর (রা) এ ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে আবূ বকর (রা)-এর কাছে আসলেন আল কুরআন সংকলনের সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। অনেক আলাপ আলোচনা ও চিন্তা ভাবনার পর যায়েদ ইবনে সাবিতের ওপর কুরআন সংকলনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। যায়েদ (রা) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এবং তৎকালীন আরবের প্রখ্যাত কারী ও হাফিজদের সহায়তায় কঠোর পরিশ্রমে পবিত্র

কুরআনের একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। এটি ছিল আবূ বকর (রা)-এর খেলাফতকালে সর্বজন স্বীকৃত সরকারি পাণ্ডুলিপি।

আবূ বকর (রা) জীবদ্দশায় পাণ্ডুলিপিটি তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি ওমর (রা)-এর অধিকারে সংরক্ষিত থাকে। তাঁর ইন্তেকালের পর হাফসা (রা) কুরআনের এ পাণ্ডুলিপিটি অত্যন্ত যত্নসহকারে নিজের কাছে সংরক্ষিত করে রাখেন। খলিফা ওমর (রা)-এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআনের এ মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নকল করে এক লক্ষ পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠানো হয়।

কিন্তু ওসমান (রা)-এর খেলাফতের সময় হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান নামক এক সাহাবী যুদ্ধ উপলক্ষে আযারবাইজান গমন করে ইরাক ও সিরিয়াবাসীদের মধ্যে কুরআন পাঠে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেন। পরে তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে এ বিষয়ে ওসমান (রা)-কে অবহিত করেন এবং কুরআনের উচ্চারণে এ পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করেন। ওসমান (রা) বিষয়টির গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি করে এ ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওসমান (রা) জানতেন যে আবূ বকর (রা)-এর সময়ে তৈরিকৃত কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপিটি হাফসা (রা)-এর কাছে সংরক্ষিত আছে। ফলে তিনি হাফসার নিকট এ মর্মে খবর পাঠান যে, তিনি যেন অবিলম্বে তাঁর কাছে সংরক্ষিত পবিত্র কুরআনের পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দেন এবং হাফসা (রা)-এর পাঠানো পাণ্ডুলিপিটির ভিত্তিতে কুরআনের নকল তৈরি করে তাঁর পাণ্ডুলিপিটি ফেরত দেয়া হবে।

হাফসা (রা) তাঁর পাণ্ডুলিপিটি খলিফা ওসমানের কাছে পাঠিয়ে দেন। ওসমান কয়েকজন লেখক যেমন– যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা) সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) এবং আবদুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশামকে কুরআনের নকল তৈরির কাজে নিয়োজিত করেন। ওসমান (রা) এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, কুরআনের লিখন ও পঠনে যদি মত পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাহলে যেন কোরায়শী রীতিতেই কুরআন লেখা হয় কেননা কোরায়শী ভাষায়ই আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

ওসমান (রা)-এর নির্দেশে এমনিভাবে কোরায়শী রীতিতেই পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষিত করা হয় যার অবিকল পাণ্ডুলিপি আজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে।

এমনিভাবে পবিত্র কুরআন সংরক্ষণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পাই মুসলমানরা যখন পবিত্র কুরআনের লিখন ও পঠনে চরম এক অনিশ্চয়তার মাঝে ছিল তখন হাফসা (রা)-এর নিকট সংরক্ষিত কুরআনের মূল পাণ্ডুলিপিটিই মুসলমানদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। যদি হাফসা (রা) যত্নসহকারে এ পাণ্ডুলিপিটি সংরক্ষণ না করতেন তবে ওসমান (রা)-এর পক্ষে হয়তো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর হতো না। হাফসা (রা) পবিত্র কুরআনের সর্বজন স্বীকৃত পাণ্ডুলিপিটি এমনিভাবে সংরক্ষণ করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অন্তরে অম্লান ও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

হাফসা (রা)-এর সাদা-সিধে জীবন : হাফসা (রা) ব্যক্তিগত জীবনে রাগী স্বভাবের হলেও তিনি ছিলেন অসম্ভব ইবাদত বন্দেগী করার একজন মানুষ। এ আল্লাহভীরু মহীয়সী নারী রাত্রি জেগে যেমন তাহাজ্জুদ আদায় করতেন, তেমনি দিনের বেলা রোযা রাখতেন। যে কারণে তিনি আল্লাহর প্রিয় বান্দীতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। মৃত্যুকালে তিনি সহোদর আবদুল্লাহকে ডেকে বলেন, 'যৎসামান্য আসবাবপত্র যা আছে, বিষয়-সম্পত্তি সবই যেন আল্লাহর রাহে গরীব-মিসকিনদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হয়।'

শিক্ষার প্রতি হাফসা (রা)-এর গভীর আগ্রহ : তৎকালীন আরবে নারীগণ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন অনেক পিছিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন তখন নারী ও পুরুষ কারো ক্ষেত্রেই তেমন ছিল না। হাফসা (রা)-এর পক্ষেও অন্যান্যদের ন্যায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ হয়নি, কিন্তু মহান শিক্ষক ও প্রিয় স্বামী রাসূল ﷺ এবং পিতা ওমর (রা)-এর সুষ্ঠু তত্ত্বাবধানে থেকে ধর্মীয় বিষয়সহ অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞান অর্জনের অপূর্ব সুযোগ পান। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী। শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তাঁর আগ্রহও ছিল প্রবল। দ্বীনী বিষয়ে যে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

একদা রাসূল ﷺ বললেন, আমি আশা করি বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী কোন সাহাবী জাহান্নামে যাবে না। হাফসা (রা) এতে আপত্তি উত্থাপন করে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তো বলেছেন- وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

অর্থ: "তোমাদের সকলকে জাহান্নামে হাযির করা হবে।" [সূরা মারইয়াম-৭১]

নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তা ঠিক, তবে এ কথাও তো আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِيْنَ فِيْهَا جِثِيًّا

অর্থ: "অতঃপর আমি আল্লাহ ভীরু লোকদের নাজাত দেব এবং জালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় ছেড়ে দেব।" [সূরা মারইয়াম : ৭২]

হাফসা (রা)-এর এ বাক্যালাপে মুগ্ধ হয়ে এবং তাঁর মধ্যে শেখা ও জানার প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করে রাসূল ﷺ সব সময় তাঁকে বিভিন্ন জিনিস শেখানো এবং জ্ঞানীরূপে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। শিফা বিন্‌ত আবদুল্লাহ (রা) নামে এক মহিলা সাহাবী লেখাপড়া জানতেন। হাফসা (রা) তাঁর নিকট থেকেই লেখা শিখেন। রাসূল ﷺ তার সকল স্ত্রীর শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে মহান ও আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন।

এ শিফা (রা) নামলা নামক এক প্রকার ক্ষতরোগ নিরাময়ের ঝাড়-ফুঁক জানতেন। জাহিলী যুগে তিনি এ ঝাড়-ফুঁক করতেন। একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমি জাহিলী জীবনে ঝাড়-ফুঁক করতাম। আপনি অনুমতি দিলে সে মন্ত্র আপনাকে শুনাবো। রাসূল ﷺ শুনে বললেন, এ ঝাড়-ফুঁকটি তুমি হাফসাকে শিখিয়ে দাও। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ শিফা (রা)-কে বলেন : তুমি কি হাফসা (রা)-কে এ 'নামলার' মন্ত্রটি শিখিয়ে দেবে না, যেমন তাঁকে লেখা শিক্ষা দিয়েছ?

এসব বর্ণনা হতে হাফসা (রা)-এর জ্ঞান চর্চার আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং এ বিষয়ে নবী ﷺ-এর ভূমিকা অবগত হওয়া যায়।

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় তাঁর অবদান

পিতা ওমর (রা)-এর কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন হাফসা (রা)। রাসূল ﷺ স্বয়ং ছিলেন তাঁর শিক্ষক। হাফসা (রা) রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, উসূল এবং শরীয়তের অন্যান্য বিষয় আদ্যপান্ত শিক্ষা লাভ করেন। যে কারণে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় সব জ্ঞানে তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তিনি পারদর্শী ছিলেন। অনেক প্রখ্যাত সাহাবীই তাঁর ছাত্রদের পর্যায়ভুক্ত ছিলেন। এ ব্যাপারে পুরুষদের মধ্যে আবদুল্লাহ

ইবনে ওমর, হামযা ইবনে আবদুল্লাহ, হারেসা ইবনে ওয়াহাব, আবদুর রহমান ইবনে হারেস (রা) প্রমূখ এবং মহিলাদের মধ্যে সাফিয়া বিনতু আবূ ওবায়দা এবং উম্মে মুবাশশির আনসারিয়ার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। হাফসা (রা)-এর জ্ঞান ও প্রতিভা সারা বিশ্বে এখনো মশহুর হয়ে আছে যা মুসলিম জাহানের কল্যাণ সাধনে অকল্পনীয় সহায়ক হয়েছে।

শিফা (রা)-এর নিকট থেকে হাফসা (রা) যেখানে রাসূলের নির্দেশে নামলার মন্ত্র শিখেছেন, সে ক্ষেত্রে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হাদীসের জ্ঞান রাসূল ﷺ থেকে অর্জন করবেন, এটাই স্বাভাবিক।

নবীপত্নী হিসেবে রাসূল ﷺ-কে কাছ থেকে দেখার, তাঁর থেকে অনেক কিছু জানার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় তিনি উজ্জ্বল অবদান রেখেছেন।

তাঁর থেকে মোট ৬০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এগুলো তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং স্বীয় পিতা ওমর (রা) থেকে শুনে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যে চারটি হাদীস মুত্তাফাকুন আলাইহি এবং ছয়টি হাদীস ইমাম বুখারী (রা) এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পুনরুক্তিসহ সহীহ বুখারীতে ১১টি, সহীহ মুসলিমে ১৪টি, জামি আত-তিরমিযীতে ১২টি, সুনান আবূ দাউদে ৬টি, সুনান আন-নাসাঈতে ৪০টি এবং সুনান ইবন মাজায় ৭টি সংকলিত হয়েছে।

হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. عَنْ حَفْصَةَ (رضى) اَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ لَمْ تَحْلِلْ اَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ ؟ قَالَ : اِنِّىْ لَبَدْتُ رَاْسِىْ وَقَلَّدْتُ هَدَفِىْ فَلاَ اَحِلُّ حَتّٰى اَنْحَرَ .

১. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! মানুষের কি হলো যে তারা ওমরার ইহরাম হতে হালাল হয়ে গেল, অথচ আপনি উমরা হতে হালাল হননি। তিনি বললেন : আমার কুরবানীর জন্তুর গলায় চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছি। কুরবানী না করা পর্যন্ত আমি হালাল হবো না।

(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ.-২১২)

٢. عَنْ حَفْصَةَ (رضى) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : خَمْسٌ مِّنَ الدَّوَابِّ لاَحَرَجَ عَلٰى مَنْ قَتَلَهُنَّ : اَلْغُرَابُ وَ الْحَدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُوْرُ۔

২. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : পাঁচটি জন্তু হত্যা করায় কোন পাপ নেই। সেগুলো হলো : কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু এবং দু'চোখের উপর কালো দাগ বিশিষ্ট পাগলা কুকুর। (বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ.-২৪৬)

٣. عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رضى) اَنَّ حَفْصَةَ (رضى) اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْاَذَانِ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ وَبَدَاَ الصُّبْحُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ تُقَامَ الصَّلٰوةُ ۔

৩. ইবনে ওমর (রা) বলেন, হাফসা (রা) তাঁকে সংবাদ দিয়েছেন যে, মুয়াযযিন যখন ফজরের আযান শেষ করতেন এবং সকালের উদয় হতো তখন নবী ﷺ ফরয সালাতে দাঁড়াবার পূর্বে হালকাভাবে দু'রাক'আত সালাত পড়তেন।
(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃ.-২৪৬)

٤. عَنْ حَفْصَةَ (رضى) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ۔

৪. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ সিয়ামদার অবস্থায় (স্ত্রীদেরকে) চুম্বন করতেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড পৃ.-২৪৬)

٥. عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَفْصَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهٗ ۔

৫. সালিম ইবন আবদুল্লাহ তাঁর পিতা হতে তিনি হাফসা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ফজরের পূর্বে দৃঢ়ভাবে সিয়ামের নিয়ত বা সংকল্প না করবে, তার সিয়াম হবে না। (সুনানে আবু দাউদ ১ম খণ্ড-পৃ. ৩৩৩)

৬. হাফসা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিছানায় শুতে আসতেন তখন তিনি তাঁর ডান হাতকে গালের নিচে রেখে এ দোয়া তিনবার পড়তেন–

رَبِّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

"হে প্রভু! তোমার বান্দাদেরকে যে দিন উত্থিত করবে সে দিনের আযাব হতে আমায় রক্ষা কর। (মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩১৯)

ওফাত : আমীর মুয়াবিয়ার শাসনামলে হিজরী ৪৫ সনে ৬৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর দিনেও হাফসা (রা) রোযা ছিলেন এবং রোযা অবস্থায়ই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তৎকালীন মদীনার শাসনকর্তা মারওয়ান বিন হাকাম তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। আবূ হোরায়রা (রা) কবর পর্যন্ত তাঁর লাশ বহন করে নিয়ে যান। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও তাঁর পুত্রগণ লাশ কবরস্থ করেন। জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। রাসূল ﷺ-এর ঔরসে তাঁর কোন সন্তান জন্মলাভ করেনি। মূলত তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

৫. উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা)

আসলে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে ইসলামের সেই প্রথম যুগেই বিধবাদের একটি লম্বা কাফেলা দাঁড়িয়ে যায়। যাঁরা ছিলেন একান্তই অসহায়। কারণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে একটু আশ্রয় পর্যন্ত ও দিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল (স) এ অসহায় মুসলমান বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

নাম ও বংশ : নাম তাঁর যয়নব। ডাকনাম أُمُّ الْمَسَاكِيْنِ বা গরীব দুঃখীর মা। পিতার নাম খুজাইমা ইবনুল হারেস এবং মাতার নাম মানদাব বিনতে আউফ। তাঁর নসবনামা এ রকম– যয়নব বিনতে খুযাইমা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে সা'আসা'আ।

জন্ম : তিনি নবুওয়্যাতের ছাব্বিশ বছর আগে বনু বকর ইবনে হাওয়াযেনে হেলালীয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ : তুফায়েল ইবনুল হারিছের সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। প্রথম স্বামীর সাথে তাঁর বনিবনা হয়নি। এ জন্য প্রথম স্বামী তাকে তালাক দিলে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে বিয়ে হয়। এ আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে তিনি একই সময়ে ইসলাম কবুল করেন। জাহাশ ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবীদের একজন। তিনি বলেছেন, আমি ওহুদ যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যাব এবং প্রতিপক্ষ আমার ঠোঁট, নাক ও কান কেটে ফেলবে এবং আমি এ অবস্থায় আল্লাহর সাথে মিলিত হবো। তখন আমাকে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে, হে আবদুল্লাহ! তোমার ঠোঁট, নাক ও কান কাটা কেন, আমি আরজ করব, হে আল্লাহ! তোমার এবং তোমার রাসূল ﷺ-এর জন্য।'

তাঁর দোয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করেন। তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে শত্রুর তরবারীর আঘাতে তাঁর তরবারি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। তখন রাসূল ﷺ তাঁর হাতে একটি ডাল তুলে দেন। তিনি ডালটিকেই তরবারী হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন এবং এক সময় শাহাদাত বরণ করেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল মুশরিকরা তাঁর ঠোঁট, নাক এবং কান কেটে ফেলেছে। যেমন তিনি আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করেছিলেন।

যয়নবসহ আরো বহু বিধবা : আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা) শাহাদাত বরণ করলে বিধবা যয়নব (রা) খুবই অসহায় হয়ে পড়েন। আসলে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে ইসলামের সেই প্রথম যুগেই বিধবাদের একটি লম্বা কাফেলা দাঁড়িয়ে যায়। যাঁরা ছিলেন একান্তই অসহায়। কারণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে একটু আশ্রয় পর্যন্তও দিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ এ অসহায় মুসলমান বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

রাসূলের সাথে বিবাহ : যয়নব (রা) ছিলেন ওহুদ যুদ্ধের ফলে যাঁরা বিধবা হয়েছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি বিধবা হওয়ার পর আত্মীয়-স্বজনের দ্বারে দ্বারে মাথা ঠুকেছেন একটু আশ্রয়ের জন্য কিন্তু তারা তাঁকে পাত্তা দেয়নি। শেষ পর্যন্ত রাসূল ﷺ তাকে সমাজে পুন:প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা ফিরিয়ে দেয়ার জন্য বিয়ে করেন। এক বর্ণনায় জানা যায়, 'অসহায়া যয়নব নিজেকে বিনা মোহরে রাসূল ﷺ-এর কাছে পেশ করেন। তবে অন্য বর্ণনা মতে রাসূল ﷺ ও তাঁর বিয়ের মোহরানা ধার্য হয়েছিল চার শত দিরহাম। হিজরী তৃতীয় সনে রাসূল ﷺ ও যয়নব (রা)-এর মধ্যে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ সময়ে যয়নব (রা)-এর বয়স ছিল ৪১ বছর এবং রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ৫৫ বছর।

চরিত্র : যয়নব (রা) ছিলেন জন্মগতভাবেই প্রশস্ত হৃদয় ও উদার প্রকৃতির মানুষ। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভূখা, নাঙা ও গরীব-দুঃখীদের বন্ধু ছিলেন। তিনি ধনাঢ্য পিতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও গরীবদের দুঃখ সইতে পারতেন না। এমন বহু ঘটনা আছে যে, তিনি খেতে বসেছেন– এমন সময় ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক এসে খাবার চেয়েছে, ব্যাস! তিনি নিজের খাবারটাই দিয়ে দিয়েছেন। এ জন্য ইসলাম গ্রহণের

আগে সে বাল্যকালেই তিনি (أُمُّ الْمَسَاكِيْن) উম্মুল মাসাকীন বা মিসকীনদের মা নামে আরবে পরিচিতা হয়ে ওঠেন।

সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের খেতাব নিঃসন্দেহে অত্যন্ত বড় ব্যাপার। জানা যায় উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণ কোন এক সময় রাসূল ﷺ-এর নিকট জানতে চান, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল। আমাদের মধ্যে সকলের আগে কে পরলোক গমন করবেন।'

রাসূল ﷺ আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী উত্তর দিলেন, أَسْرَعُكُنَّ لُحُوْقًا بِيْ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا . 'তোমাদের মধ্যে যার হাত সর্বাপেক্ষা বড় সে সকলের আগে মৃত্যুবরণ করবে।' সকলেই ভাবলেন মাপের দিক দিয়ে সওদা (রা)-এর হাত তুলনামূলকভাবে যেহেতু বড় সেহেতু সম্ভবত তিনি সবার আগে ইন্তেকাল করবেন। কিন্তু সবার আগে যখন যয়নব (রা) ইন্তেকাল করলেন তখন সবাই বুঝলেন রাসূল ﷺ কী বুঝাতে চেয়েছিলেন। আসলে রাসূল ﷺ যয়নব (রা)-এর দান-খয়রাতের হাতকে বড় বলেছিলেন।

ওফাত : যয়নব (রা) রাসূল ﷺ-এর সাথে বিয়ের মাত্র তিন মাস পরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর উপস্থিতিতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। উম্মাহাতুল মু'মীনীনদের মধ্যে এ ভাগ্য আর কারো হয়নি। যদিও খাদীজা (রা)ও রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খাদীজা (রা) যখন ইন্তেকাল করেন তখন জানাযার সালাতের হুকুম হয়নি।

মৃত্যুকালে এ সৌভাগ্যবতী যয়নব (রা)-এর বয়স হয়েছিল মাত্র ৪১ বছর। এত কম বয়সেও রাসূল ﷺ-এর কোন স্ত্রী ইন্তেকাল করেননি। তাঁকে মদীনার বিখ্যাত কবরস্থান জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

৬. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা)

ক. আমি আভিজাত্যের অহংকারে অহংকারী মেয়ে।

খ. আমি একজন বিধবা মহিলা, আমার সন্তানাদি আছে।

গ. আমি একা, বিয়ের কাজ সম্পাদন করার আমার কেউ নেই।

নাম ও পরিচয় : রাসূল ﷺ-এর ষষ্ঠ স্ত্রী ছিলেন উম্মু সালামা (রা)। তাঁর মূল নাম ছিল হিন্দ। ডাক নাম উম্মু সালামা। এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে আছেন। পিতার আসল নাম সুহাইল, ডাক নাম আবূ উমাইয়া। ইনি কুরাইশ বংশের মাখজুম গোত্রের লোক। মায়ের নাম আতিকা। পিতার দিক থেকে তাঁর বংশ তালিকা ছিল- হিন্দ বিনতে আবূ উমাইয়া সুহাইল ইবনে মুগীরা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখজুম। আর মায়ের দিক থেকে হিন্দ বিনতে আতিকা বিনতে আমের ইবনে রাবীয়াহ ইবনে মালেক কেনানা।

সামাজিক মর্যাদা : উম্মু সালামা (রা)-এর পিতা-মাতা উভয় দিক থেকেই তৎকালীন আরবের খুবই মর্যাদাসম্পন্ন বংশের লোক ছিলেন। তাঁর পিতা আবূ উমাইয়া ছিলেন আরবের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি এতটাই উদার, দানশীল এবং হৃদয় খোলা মানুষ ছিলেন যে, 'যাদুর রাকিব' উপাধিতে ভূষিত হন। মাঝে মধ্যে যখন সফরে যাওয়ার প্রয়োজন হত তখন আবূ উমাইয়া পুরো কাফেলার ব্যয়ভার নিজেই বহন করতেন। এজন্যই তাঁর উপাধি দেয়া হয় زَادُ الرَّكِبِ 'যাদুর রাকিব' বা মুসাফিরের পাথেয়।

প্রথম বিবাহ : উম্মু সালামা (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয় তাঁরই চাচাত ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদের সাথে। তিনি রাসূল ﷺ-এর দুধ ভাই ছিলেন। মূল নাম আবদুল্লাহ হলেও পরবর্তীতে তিনি আবূ সালামা নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ ও হিযরত : ইসলামের একান্ত প্রাথমিক অবস্থায়, যখন ইসলাম কবুল করা মানে বিপদের পাহাড়কে নিজের মাথায় তুলে নেয়ার মতো অবস্থা ঠিক এ বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় উম্মু সালামা এবং তাঁর স্বামী পরিবার পরিজনের তীব্র বিরোধিতার মুখে ইসলাম কবুল করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের ওপর নেমে আসে নানা অত্যাচার-নির্যাতন। শেষ পর্যন্ত মক্কায় টিকতে না পেরে তাঁরা অন্যান্য মুসলমানদের সাথে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আবিসিনিয়া হিজরত করেন। এখানেই তাঁদের প্রথম সন্তান সালামা জন্মগ্রহণ করেন। এ পুত্র সালামার নামেই স্বামী আবূ সালামা এবং স্ত্রী উম্মু সালামা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

জানা যায়, আবিসিনিয়ার আবহাওয়া সালামা পরিবারের স্বাস্থ্যের অনুকূলে ছিল না। যে কারণে তাঁরা বাধ্য হয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন।

হিজরতের করুণ চিত্র : এখানে উল্লেখ্য যে, উম্মু সালামা (রা) মদীনায় হিজরতকারী প্রথম মহিলা। কিন্তু মদীনায় হিজরতের অভিজ্ঞতা ছিল খুবই তিক্ত ও দুঃখজনক। ঐতিহাসিক ইবনে আসীর সে ঘটনাটি উম্মু সালামার জবানীতেই পেশ করেছেন। তিনি বলেন, 'আবূ সালামা যখন মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাঁর কাছে একটি মাত্র উট ছিল। তিনি আমাকে এবং আমার পুত্র সালামাকে তার পিঠে সওয়ার করান। তিনি নিজে উটের লাগাম ধরে রওয়ানা করেন। বনু মুগীরা ছিল আমার সমগোত্রীয়।

এ গোত্রের লোকেরা আমাদেরকে দেখে ফেলে এবং আবূ সালামাকে বাধা দিয়ে বলে যে, আমরা আমাদের কন্যাকে এত খারাপ অবস্থায় যেতে দেবো না। তারা আবূ সালামার হাত থেকে লাগাম ছিনিয়ে নেয় এবং আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলে যায়। ইতোমধ্যে আবূ সালামার বংশের লোক বনু আবদুল আসাদ এসে পৌঁছে। তারা পুত্র সালামাকে ছিনিয়ে নেয় এবং বনু মুগীরাকে জানিয়ে দেয় যে, তোমরা তোমাদের কন্যাকে স্বামীর সাথে যেতে না দিলে আমরাও আমাদের শিশুকে তোমাদের কন্যার সাথে কিছুতেই যেতে দেব না।

এখন আমি, আমার স্বামী এবং পুত্র সন্তান তিনজনই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। শোকে-দুঃখে আমার অবস্থা বেগতিক। যেহেতু হিজরতের হুকুম হয়েছিল, তাই আবূ সালামা মদীনায় চলে যান। আমি একা রয়ে যাই। প্রতিদিন ভোরে ঘর থেকে বের হতাম এবং একটা পাহাড়ে বসে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রন্দন করতাম। প্রায় এক বছর আমাকে এ অবস্থায় কাটাতে হয়।

একদিন বনু মুগীরার এক ব্যক্তি, যিনি ছিলেন আমার বন্ধু, আমার এ অস্থিরতা দেখে দয়া পরবশ হয়ে তার বংশের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, আপনারা এ অসহায়কে কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না? একে তো আপনারা স্বামী এবং সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছেন। তার এ কথাগুলো বেশ কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের মনে দয়ার উদ্রেক হয়। তারা আমাকে অনুমতি দিয়ে বলে যে, তোমার ইচ্ছে হলে স্বামীর কাছে যেতে পার।

এটা শুনে বনু আবদুল আসাদের লোকেরাও আমার কাছে সন্তান ফেরত দেয়। এবার উটের পিঠে হাওদা বেঁধে পুত্র সালামাকে বুকে নিয়ে সওয়ার হই। আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। এ অবস্থায় কোবায় পৌঁছি। সেখানে ওসমান ইবনে তালহা ইবনে আবূ তালহার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার অবস্থা জানতে পেরে জিজ্ঞেস করেন, তোমার সাথে কেউ আছে? আমি বললাম, না, আমি একা।

আর আমার এ শিশু সন্তান। তিনি আমার উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যান। আল্লাহ্ সাক্ষী, তালহার চেয়ে ভালো লোক আরবে আমি পাইনি। মনযিল এলে আমার অবতরণ দরকার হলে তিনি গাছের আড়ালে চলে যেতেন। রওয়ানা করার সময় হলে তিনি উট নিয়ে আসতেন। আমি ভালোভাবে বসলে তিনি উটের লাগাম ধরে আগে আগে গমন করতেন। গোটা পথ এভাবে কাটে। মদীনা পৌঁছে বনু আমের ইবনে আওফ-এর জনপদ কোবা অতিক্রমকালে ওসমান ইবনে আবূ তালহা আমাকে জানান যে, তোমার স্বামী এ গ্রামে আছেন। আবূ সালামা এখানে অবস্থান করছেন।

তাঁর উপর নির্যাতন : আমরা যদি ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে নজর দেই তাহলে দেখবো হিজরতকালীন সময়ে আবূ সালামার গোত্রের ওপর যে অত্যাচার-নির্যাতন হয়েছে, যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে অন্যদের বেলায় তেমন হয়নি। উম্মু সালামা নিজেই বলেন, 'ইসলামের জন্য আবূ সালামার গোত্রকে যে কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, তা আহলে বাইতের আর কাউকে সইতে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।'

উম্মু সালামা এমনই মর্যাদাবান পিতার সন্তান ছিলেন যে, যখন হিজরতকালে তিনি মদীনার কোবা পল্লীতে পৌঁছান তখন তাঁর পরিচয় জানতে পেরে কেউই তা বিশ্বাস করতে চায়নি। কারণ ঐ জাহেলী যুগেও কুরাইশ বংশের আবূ উমাইয়ার মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা এমনি একা বেড়াতেন না। কিন্তু উম্মু সালামার

ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ইসলামের হুকুম আহকাম সর্বোপরি আল্লাহ্র নির্দেশকে নিজের জীবনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এর কিছুদিন পর হজ্জ করার জন্য কিছু লোক যখন মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তখন উম্মু সালামা তাঁর পরিবারের কাছে একটা চিঠি পাঠান। এবার সবাই বিশ্বাস করে যে, সত্যিই তিনি কুরাইশ বংশের আবূ উমাইয়ার সন্তান।

স্বামীর সাথে স্বাক্ষাত ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ : আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে স্বামীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। আবূ সালামার সন্ধান দিয়ে ওসমান ইবনে আবূ তালহা মক্কা ফিরে যান। এ ঘটনাটি উম্মু সালামার ওপর খুব প্রভাব ফেলে। তিনি তার সারা জীবনেও ঘটনাটি ভুলেননি এবং ওসমান ইবনে তালহার মহানুভবতার কথা স্মরণ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন–

مَا رَأَيْتُ صَاحِبًا قَطُّ اَكْرَمُ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ -

'আমি কখনো ওসমান ইবনে তালহার চেয়ে ভালো সাথী কাউকে দেখিনি।'

মদীনায় স্বামীর সাথে একত্রিত হওয়ার পর তাঁরা আবার সাংসারিক জীবন শুরু করেন। কিন্তু বেশিদিন একত্র থাকা সম্ভব হয়নি। এরই মধ্যে ডাক আসে ওহুদ যুদ্ধের। বীর যোদ্ধা আবূ সালামা ওহুদ যুদ্ধে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ যুদ্ধে তিনি বহু শত্রু সৈন্যকেও নিধন করেন। তবে শত্রুর নিক্ষিপ্ত একটি তীর তাঁর বাহুতে এসে বিদ্ধ হয়। জখমটা ছিল মারাত্মক। দীর্ঘ একমাস চিকিৎসার পর তিনি কোনো রকম সুস্থ হয়ে ওঠেন।

জানা যায় এ ঘটনারও দু'বছর এগার মাস পর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তিনি 'কতন' এলাকায় একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্বামীর শাহাদাত বরণ এ যুদ্ধে প্রায় এক মাস সময় লেগে যায়। এখানেও তিনি আঘাতপ্রাপ্ত হন। যতদূর জানা যায়, এ আঘাতটা তাঁর পূর্বের জখমকে কাঁচা করে দেয় এবং তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। জখমের তীব্রতা বাড়তে থাকে। এ অবস্থায় তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-কে এ বলে সান্ত্বনা দিতেন।

'আমি রাসূলে করীম ﷺ-এর নিকট শুনেছি, কেউ যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে দুঃশ্চিন্তা না করে সে যেন বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।'

কারণ, আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার অনুভূতিই মু'মিনের জীবনে বিপদের মুহূর্তে প্রশান্তি দিতে পারে। তিনি এ বলেও প্রার্থনা করতে বলেছেন–

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهٖ اَللّٰهُمَّ اخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا اِلاَّ عَطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

"হে আল্লাহ! আমি আমার এ বিপদে তোমার কাছেই প্রতিদান চাচ্ছি। তুমি আমাকে এর চাইতেও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করো, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন।'

আবূ সালামার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিন সকালে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে দেখার জন্যে উপস্থিত হলেন। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তেই আবূ সালামা (রা) ইন্তেকাল করলেন। রাসূলে করীম ﷺ নিজ হাতে তাঁর চোখ দুটি বুঁজিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করলেন–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمُقَرَّبِيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ، وَافْسِحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ ـ

'হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে তোমার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তাঁর পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো এবং তাঁকে ও আমাদের সকলকে ক্ষমা করো। তাঁর কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দাও।'

রাসূল ﷺ থেকে তার স্বামী কর্তৃক বর্ণিত সেই দু'আ উম্মু সালামা (রা) স্মরণ হলো। তিনি– 'হে আল্লাহ! বিপদে তোমার কাছেই এর প্রতিদান চাচ্ছি'– পর্যন্ত বলে থমকে গেলেন এবং মনে মনে বললেন : 'আবূ সালামার চেয়ে উত্তম জীবন সঙ্গী আর কে হতে পারে?'

হিজরী ৪ সালের জমাদিউল উখরার ৯ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। উম্মু সালামার গর্ভে আবু সালামার ঔরসজাত দুইজন পুত্র সন্তান ছিল– সালামা ও উমার ও ২ জন কন্যা ছিল যয়নব (রা) ও রুকাইয়া (রা)।

সব কথা শুনে রাসূল ﷺ উম্মু সালামাকে বললেন, 'হে উম্মু সালামা! তোমার যে ইয়াতিম সন্তানদের কথা উল্লেখ করেছ তাদের লালন-পালনের ব্যবস্থা আল্লাহই করবেন, আর তোমার কেউ নেই সে সমস্যারও সমাধান হবে।' তার উত্তরে উম্মু সালামা ছেলে ওমরকে বললেন, যাও মহানবী ﷺ-এর সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর। এর কিছুদিন পর রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সময়টা ছিল হিজরী চতুর্থ সালের শাওয়াল মাস।

বিয়ের সময় রাসূল ﷺ উম্মু সালামাকে দু'টি যাঁতা, একটি কলসী এবং খুরমার বাকলে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দান করেছিলেন।

উম্মু সালামা ছিলেন খুবই সুন্দরী ও লজ্জাবতী মহিলা। তাই দাম্পত্য জীবনে স্বাভাবিক হতে একটু বিলম্ব হয়। নবী করীম ﷺ তাঁর গৃহে আসতেই তিনি লজ্জায় কন্যা যয়নবকে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন। বিয়ের পর ৪ জন সন্তান-সন্ততিসহ উম্মু সালামা নবীজীর গৃহে আসেন এবং সংসার জীবন শুরু করেন। নবী স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত ছিলেন। এর একটির নেতৃত্বে ছিলেন আয়েশা (রা) এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন উম্মু সালামা (রা)।

উম্মু সালামার বিচক্ষণতা : উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উম্মু সালামা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণে রাসূল ﷺ-কে সহযোগিতা করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল– হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ সেখানেই সকলকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে কেউই রাসূল ﷺ-এর হুকুম মতো কাজ করেননি। বরং চুপচাপ বসেছিলেন। আসলে বাহ্যত হুদায়বিয়ার সন্ধিটা ছিল বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। যে কারণে মুসলমানেরা খুবই মনঃকষ্টে ভুগছিলেন।

রাসূল ﷺ কুরবানী করার জন্য পর পর তিনবার নির্দেশ দেন কিন্তু তবুও মুসলমানেরা যখন কুরবানী না করে চুপ রইলেন তখন অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তিনি নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং উম্মু সালামার কাছে পূর্বাপর সকল কিছু খুলে বললেন। উম্মু সালামা তখন রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আপনি কাউকে কিছুই বলবেন না বরং বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানী নিজে করে ফেলুন এবং ইহরাম ত্যাগ করার জন্য মাথার চুল কেটে ফেলুন।' তাঁর কথামত রাসূল ﷺ বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের কুরবানী নিজে করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে (ন্যাড়া করে)

কারণ, আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার অনুভূতিই মু'মিনের জীবনে বিপদের মুহূর্তে প্রশান্তি দিতে পারে। তিনি এ বলেও প্রার্থনা করতে বলেছেন—

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اِحْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِىْ هٰذِهٖ اَللّٰهُمَّ اخْلُفْنِىْ خَيْرًا مِّنْهَا اِلاَّ عَطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ

"হে আল্লাহ! আমি আমার এ বিপদে তোমার কাছেই প্রতিদান চাচ্ছি। তুমি আমাকে এর চাইতেও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করো, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন।'

আবূ সালামার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিন সকালে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে দেখার জন্যে উপস্থিত হলেন। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তেই আবূ সালামা (রা) ইন্তেকাল করলেন। রাসূলে করীম ﷺ নিজ হাতে তাঁর চোখ দুটি বুঁজিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করলেন—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِىْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِى الْمُقَرَّبِيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَقِبِهٖ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ، وَافْسِحْ لَهٗ فِىْ قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ ـ

'হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে তোমার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো, তাঁর পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো এবং তাঁকে ও আমাদের সকলকে ক্ষমা করো। তাঁর কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দাও।'

রাসূল ﷺ থেকে তার স্বামী কর্তৃক বর্ণিত সেই দু'আ উম্মু সালামা (রা) স্মরণ হলো। তিনি— 'হে আল্লাহ! বিপদে তোমার কাছেই এর প্রতিদান চাচ্ছি'— পর্যন্ত বলে থমকে গেলেন এবং মনে মনে বললেন : 'আবূ সালামার চেয়ে উত্তম জীবন সঙ্গী আর কে হতে পারে?'

হিজরী ৪ সালের জমাদিউল উখরার ৯ তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন। উম্মু সালামার গর্ভে আবু সালামার ঔরসজাত দুইজন পুত্র সন্তান ছিল— সালামা ও উমার ও ২ জন কন্যা ছিল যয়নব (রা) ও রুকাইয়া (রা)।

সব কথা শুনে রাসূল ﷺ উম্মু সালামাকে বললেন, 'হে উম্মু সালামা! তোমার যে ইয়াতিম সন্তানদের কথা উল্লেখ করেছ তাদের লালন-পালনের ব্যবস্থা আল্লাহ্ই করবেন, আর তোমার কেউ নেই সে সমস্যারও সমাধান হবে।' তার উত্তরে উম্মু সালামা ছেলে ওমরকে বললেন, যাও মহানবী ﷺ-এর সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা কর। এর কিছুদিন পর রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। সময়টা ছিল হিজরী চতুর্থ সালের শাওয়াল মাস।

বিয়ের সময় রাসূল ﷺ উম্মু সালামাকে দু'টি যাঁতা, একটি কলসী এবং খুরমার বাকলে ভর্তি একটি চামড়ার বালিশ দান করেছিলেন।

উম্মু সালামা ছিলেন খুবই সুন্দরী ও লজ্জাবতী মহিলা। তাই দাম্পত্য জীবনে স্বাভাবিক হতে একটু বিলম্ব হয়। নবী করীম ﷺ তাঁর গৃহে আসতেই তিনি লজ্জায় কন্যা যয়নবকে কোলে নিয়ে বসে থাকতেন। বিয়ের পর ৪ জন সন্তান-সন্ততিসহ উম্মু সালামা নবীজীর গৃহে আসেন এবং সংসার জীবন শুরু করেন। নবী স্ত্রীগণ দু'টি দলে বিভক্ত ছিলেন। এর একটির নেতৃত্বে ছিলেন আয়েশা (রা) এবং অপরটির নেতৃত্বে ছিলেন উম্মু সালামা (রা)।

উম্মু সালামার বিচক্ষণতা : উপস্থিত বুদ্ধির জোরে উম্মু সালামা (রা) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উত্তরণে রাসূল ﷺ-কে সহযোগিতা করেছিলেন। ঘটনাটি ছিল– হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ সেখানেই সকলকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে কেউই রাসূল ﷺ-এর হুকুম মতো কাজ করেননি। বরং চুপচাপ বসেছিলেন। আসলে বাহ্যত হুদায়বিয়ার সন্ধিটা ছিল বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে। যে কারণে মুসলমানেরা খুবই মনঃকষ্টে ভুগছিলেন।

রাসূল ﷺ কুরবানী করার জন্য পর পর তিনবার নির্দেশ দেন কিন্তু তবুও মুসলমানেরা যখন কুরবানী না করে চুপ রইলেন তখন অত্যন্ত বিষণ্ন মনে তিনি নিজ তাঁবুতে ফিরে গেলেন এবং উম্মু সালামার কাছে পূর্বাপর সকল কিছু খুলে বললেন। উম্মু সালামা তখন রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'আপনি কাউকে কিছুই বলবেন না বরং বাইরে গিয়ে নিজের কুরবানী নিজে করে ফেলুন এবং ইহরাম ত্যাগ করার জন্য মাথার চুল কেটে ফেলুন।' তাঁর কথামত রাসূল ﷺ বাইরে বেরিয়ে এসে নিজের কুরবানী নিজে করলেন এবং মাথা মুড়িয়ে (ন্যাড়া করে)

ফেললেন। এরপর দেখা গেল একে একে সবাই রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে কুরবানী করলেন এবং ইহরাম ত্যাগ করলেন। এমন কি মাথা মুড়ানোর জন্য মোটামুটি ভিড় লেগে গিয়েছিল যে, কার আগে কে মাথা মুড়াবে।

বুঝা যায় উম্মু সালামা (রা) কেমন বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিভিত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের কারণেই সেদিন বড় ধরনের সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন বলেছেন, 'মহিলা জগতের ইতিহাসে সঠিক সিদ্ধান্ত দানের এত বড় দৃষ্টান্ত আর নেই।' (যুরকানী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২)

তাঁর মেধা : উম্মু সালামা সম্পর্কে মাহমুদ বিন লবিদ বলেন, 'যদিও মহানবী ﷺ-এর সকল পত্নী আল্লাহর রাসূলের প্রচুর হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন, তবু তাদের মধ্যে আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা)-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।' তিনি রাসূল ﷺ-এর মতোই সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন এবং ছাত্রদের শেখাতেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন, মনে রাখতেন এবং আমল করার চেষ্টা করতেন।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ইবনে কিয়াম লিখেছেন, 'উম্মু সালামার ফতোয়াসমূহ যদি একত্রিত করা যায় তাহলে তা দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তৈরি হতে পারে।'

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে উম্মু সালামা (রা)-এর অবদান

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় উম্মু সালামা (রা)-এর অবদান অনস্বীকার্য। হাদীস বর্ণনা ও প্রচারে আয়েশা (রা)-এর পরেই তাঁর স্থান। এ সম্পর্কে মাহ্মূদ ইবনে লবীদ বলেন–

كَانَ اَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْفَظْنَ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيْرًا وَّلاَ مِثْلاً لِعَائِشَةَ وَاُمِّ سَلَمَةَ ـ

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের বহু হাদীস মুখস্থ ছিল। তবে আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা)-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না"।

(আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫; হায়াতুস সাহাবা)

হাদীস শুনার প্রতি উম্মু সালামা (রা)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূল ﷺ ভাষণ দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি কেবল, "ওহে লোক সকল! বলেছেন, আর অমনি উম্মু সালামা

٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَاَقْبَلَ اِبْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَ ذٰلِكَ بَعْدَ اَنْ اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ . فَقَالَ : اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ اَعْمٰى؟ لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفَعُمْيَاوَ اَنِ اَنْتُمَا؟ اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ .

৪. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। সেখানে মায়মূনাও (রা) ছিলেন। ইবনে উম্মু মাকতূম আসলেন। এটা পর্দার বিধান নাযিল হবার পরের ঘটনা। নবী ﷺ বললেন, তোমরা তাঁর থেকে পর্দা কর। আমরা বললাম : হে রাসূল ﷺ সে তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতেও পারছে না, চিনতেও পারছে না। নবী ﷺ বললেন : তোমরাও কি অন্ধ, তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না? (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮)

ইবাদত বিষয়ক

٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ : مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةُ مِنَ الْفِتْنَةِ، مَا ذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ؟ اَلاَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ .

৫. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ কোন এক রাতে ঘুম থেকে জেগে বললেন : সুবহানাল্লাহ্! কতই না ফিতনা এবং ধনভাণ্ডার এ রাতে নাযিল হয়েছে। এমন কে আছে যে, হুজরার অধিবাসীদেরকে জাগাবে? এমন অনেক লোক আছে যারা দুনিয়ায় কাপড় পরিধান করছে, অথচ আখিরাতে তারা হবে উলঙ্গ। (সহীহ আল-বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১)

٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : شَكَوْتُ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ اَنْ اَشْتَكِىَ، فَقَالَ : طُوْفِىْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطُفْتُ وَ

ফেললেন। এরপর দেখা গেল একে একে সবাই রাসূল ﷺ-এর অনুসরণে কুরবানী করলেন এবং ইহরাম ত্যাগ করলেন। এমন কি মাথা মুড়ানোর জন্য মোটামুটি ভিড় লেগে গিয়েছিল যে, কার আগে কে মাথা মুড়াবে।

বুঝা যায় উম্মু সালামা (রা) কেমন বুদ্ধিমতি মহিলা ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিভিত্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের কারণেই সেদিন বড় ধরনের সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এ ব্যাপারে ইমামুল হারামাইন বলেছেন, 'মহিলা জগতের ইতিহাসে সঠিক সিদ্ধান্ত দানের এত বড় দৃষ্টান্ত আর নেই।' (যুরকানী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৭২)

তাঁর মেধা : উম্মু সালামা সম্পর্কে মাহমুদ বিন লবিদ বলেন, 'যদিও মহানবী ﷺ-এর সকল পত্নী আল্লাহর রাসূলের প্রচুর হাদীস স্মৃতিতে ধারণ করেছিলেন, তবু তাদের মধ্যে আয়েশা (রা) এবং উম্মু সালামা (রা)-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না।' তিনি রাসূল ﷺ-এর মতোই সুন্দর সুরে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন এবং ছাত্রদের শেখাতেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর প্রত্যেকটি কথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শুনতেন, মনে রাখতেন এবং আমল করার চেষ্টা করতেন।

মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে ইবনে কিয়াম লিখেছেন, 'উম্মু সালামার ফতোয়াসমূহ যদি একত্রিত করা যায় তাহলে তা দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা তৈরি হতে পারে।'

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে উম্মু সালামা (রা)-এর অবদান

হাদীস শিক্ষা ও বর্ণনায় উম্মু সালামা (রা)-এর অবদান অনস্বীকার্য। হাদীস বর্ণনা ও প্রচারে আয়েশা (রা)-এর পরেই তাঁর স্থান। এ সম্পর্কে মাহমূদ ইবনে লবীদ বলেন–

كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَحْفَظْنَ مِنْ حَدِيْثِ النَّبِيِّ ﷺ كَثِيْرًا وَّلَا مِثْلاً لِعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণের বহু হাদীস মুখস্থ ছিল। তবে আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা)-এর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না"।

(আনসাবুল আশরাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১৫; হায়াতুস সাহাবা)

হাদীস শুনার প্রতি উম্মু সালামা (রা)-এর প্রবল আগ্রহ ছিল। একদিন তিনি চুলের বেনী বাঁধাচ্ছিলেন। এমন সময় রাসূল ﷺ ভাষণ দেয়ার জন্য মসজিদের মিম্বারে দাঁড়ালেন। তিনি কেবল, "ওহে লোক সকল! বলেছেন, আর অমনি উম্মু সালামা

٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ فَاَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَ ذٰلِكَ بَعْدُ اَنْ اُمِرْنَا بِالْحِجَابِ. فَقَالَ : اِحْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَلَيْسَ اَعْمٰى؟ لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَفَعُمْيَاوَ اَنِ اَنْتُمَا؟ اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.

৪. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-এর কাছে ছিলাম। সেখানে মায়মূনাও (রা) ছিলেন। ইবনে উম্মু মাকতূম আসলেন। এটা পর্দার বিধান নাযিল হবার পরের ঘটনা। নবী ﷺ বললেন, তোমরা তাঁর থেকে পর্দা কর। আমরা বললাম : হে রাসূল ﷺ সে তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতেও পারছে না, চিনতেও পারছে না। নবী ﷺ বললেন : তোমরাও কি অন্ধ, তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছো না? (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬৮)

ইবাদত বিষয়ক

٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِسْتَيْقَظَ لَيْلَةً فَقَالَ : مَاذَا اُنْزِلَ اللَّيْلَةُ مِنَ الْفِتْنَةِ، مَا ذَا اُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ؟ مَنْ يُوْقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ ؟ اَلاَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِى الْاٰخِرَةِ.

৫. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। নবী ﷺ কোন এক রাতে ঘুম থেকে জেগে বললেন : সুবহানাল্লাহ্! কতই না ফিতনা এবং ধনভাণ্ডার এ রাতে নাযিল হয়েছে। এমন কে আছে যে, হুজরার অধিবাসীদেরকে জাগাবে? এমন অনেক লোক আছে যারা দুনিয়ায় কাপড় পরিধান করছে, অথচ আখিরাতে তারা হবে উলঙ্গ। (সহীহ আল-বুখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১)

٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : شَكَوْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ اَنْ اَشْتَكِىَ، فَقَالَ : طُوْفِىْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَاَنْتِ رَاكِبَةٌ، فَطَفْتُ وَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ يُصَلِّىْ اِلٰى جَانِبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَاُ بِالطُّوْرِ وَ كِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ.

৬. উম্মু সালামা (রা) বলেন, হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অসুস্থতার অভিযোগ করলে তিনি বললেন : সাওয়ারে আরোহিনী হয়ে লোকদের পিছনে পিছনে তুমি তাওয়াফ কর। আমি তাওয়াফ করলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহের পার্শ্বে সূরা তুর পাঠ করে সালাত পড়ছিলেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ.-৪১৩)

٧. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ : عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ اِدْبَارُ نَهَارِكَ وَ اَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ.

৭. উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমায় মাগরিবের আযানের পরে এ দোয়া পড়তে শিখিয়েছিলন : اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْلِىْ. হে আল্লাহ! নিশ্চয় এটি আপনার রাতের আগমন, দিবসের পশ্চাত গমন এবং আপনার আহ্বানের আওয়াজ। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। (সুনান আবু দাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭)

٨. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : مَا رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ و رَمَضَانَ.

৮. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে শা'বান ও রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন.মাসে ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে দেখিনি। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫)

٩. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهٖ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهٗ يَاْتِيْنِى الْخَصَمُ فَلَعَلَّ

তুমি যদি চাও তবে সাত দিন তোমার কাছে কাটাব। যদি সাত দিন তোমার কাছে কাটাই, তবে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন করে কাটাব। (বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯)

١٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ ثَوْبٌ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَمِيْصٍ -

১৪. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কামীস-এর চেয়ে কোন পোশাকই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল না।

(মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-২৫০)

পবিত্রতা বিষয়ক

١٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : إِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ زُهَيْرٌ : إِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِيْ أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَحْثِيَ عَلَيْهِ ثَلاَثًا -

১৫. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈকা মুসলিম মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : আমার চুল খুব ঘন ও ঝুটি বাঁধা। আমি কি জানাবাত হতে পবিত্র হওয়ার জন্য চুল কমিয়ে ফেলব? নবী ﷺ বললেন : তিনবার চুলে পানি ঢালাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩)

١٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَا يَغْتَسِلاَنِ فِيْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ -

১৬. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ রোযা অবস্থায় তাঁকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁরা দু'জন একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।

(মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪৩)

رَسُوْلُ اللّٰهِ يُصَلِّيْ اِلٰى جَانِبِ الْبَيْتِ، وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ و كِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ.

৬. উম্মু সালামা (রা) বলেন, হজ্জে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অসুস্থতার অভিযোগ করলে তিনি বললেন : সাওয়ারে আরোহিনী হয়ে লোকদের পিছনে পিছনে তুমি তাওয়াফ কর। আমি তাওয়াফ করলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা গৃহের পার্শ্বে সূরা তুর পাঠ করে সালাত পড়ছিলেন। (মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ.-৪১৩)

٧. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ : عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ : اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ اِدْبَارُ نَهَارِكَ وَ اَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِيْ.

৭. উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমায় মাগরিবের আযানের পরে এ দোয়া পড়তে শিখিয়েছিলন : اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِيْ. হে আল্লাহ! নিশ্চয় এটি আপনার রাতের আগমন, দিবসের পশ্চাত গমন এবং আপনার আহ্বানের আওয়াজ। সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। (সুনান আবু দাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭)

٨. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : مَا رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اِلاَّ شَعْبَانَ و رَمَضَانَ.

৮. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ-কে শা'বান ও রমযান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে ক্রমাগত দু'মাস রোযা রাখতে দেখিনি। (তিরমিযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫)

٩. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصْمٍ بِبَابِ حُجْرَتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ : اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّهُ يَاْتِيْنِى الْخَصَمُ فَلَعَلَّ

তুমি যদি চাও তবে সাত দিন তোমার কাছে কাটাব। যদি সাত দিন তোমার কাছে কাটাই, তবে আমার অন্যান্য স্ত্রীদের কাছেও সাতদিন করে কাটাব। (বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৯)

١٤. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ ثَوْبَ أَحَبَّ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَمِيْصٍ.

১৪. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : কামীস-এর চেয়ে কোন পোশাকই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল না।

(মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ.-২৫০)

পবিত্রতা বিষয়ক

١٥. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) قَالَتْ : إِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ زُهَيْرٌ : إِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّىْ امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرِ رَأْسِىْ أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَحْثِىَ عَلَيْهِ ثَلاَثًا.

১৫. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : জনৈকা মুসলিম মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন : আমার চুল খুব ঘন ও ঝুটি বাঁধা। আমি কি জানাবাত হতে পবিত্র হওয়ার জন্য চুল কমিয়ে ফেলব? নবী ﷺ বললেন : তিনবার চুলে পানি ঢালাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (আবু দাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩)

١٦. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَا يَغْتَسِلاَنِ فِىْ إِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

১৬. উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ রোযা অবস্থায় তাঁকে চুম্বন দিতেন এবং তাঁরা দু'জন একই পাত্র থেকে গোসল করতেন।

(মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৪৩)

শিক্ষা বিষয়ক

١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّهَا ذَكَرَتْ اَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ يَقْطَعُ قِرَائَتَهُ اٰيَةً اٰيَةً ـ

১৭. আব্দুল্লাহ ইবন আবূ মুলায়কা উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ্-এর পর সূরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াত উল্লেখ করে বললেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি আয়াতে থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন।

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৬।)

চিকিৎসা বিষয়ক

١٨. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى فِىْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سَفْعَةً ـ فَقَالَ : اِسْتَرْقُوْا لَهَا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ ـ

১৮. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ তাঁর ঘরে এক মেয়েকে দেখলেন, যার চেহারায় কালো কুচকে দাগ পড়ে গিয়েছে। নবী ﷺ বললেন : দোয়া পড়ে তাতে ফুঁক দাও। কেননা এতে নজর লেগেছে।

এরূপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আমরা তাঁর থেকে লাভ করে থাকি।

উম্মু সালামা (রা) অতিশয় লাজুক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। বিয়ের পর রাসূল ﷺ যখন উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে আসতেন তখন তিনি লজ্জার কারণে মেয়ে যয়নবকে কোলে করে বসে থাকতেন। এ অবস্থা বেশ কিছু দিন বহাল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন অত্যন্ত আমলদার একজন মহিলা। বিদায় হজ্জের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু যথার্থ ওজর থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে গমন করেন, তখন রাসূল ﷺ তাওয়াফ সম্পর্কে বললেন, 'উম্মু সালামা, ফজরের সালাত চলাকালে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তুমি তাওয়াফ করবে।'

দাস প্রথা ও যায়েদ : তৎকালীন আরব সমাজে অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সাথে বাজারে মানুষও বেচাকেনা হতো। যাদেরকে বাজারে পণ্য সামগ্রীর মতো বেচাকেনা করা হতো তারা ক্রীতদাসরূপে পরিচিত ছিল। নবুওয়্যাতের পূর্বে ও সূচনালগ্নেও এ প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীকালে রাসূল ﷺ খোলাফায়ে রাশেদা, সাহাবাগণ ও পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণ ধীরে ধীরে এ কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন।

সেই জাহেলী যুগের প্রথা অনুযায়ী খাদীজা (রা)-এর ভাতিজা হাকীম ইবনে খুযাইমা বাজার থেকে যায়েদ ইবনে হারিসা নামের এক দাস বালককে কিনে এনে ফুফুকে উপহার হিসেবে দিলেন। পরবর্তীতে খাদীজা প্রিয় দাস যায়েদকে স্বামী মুহাম্মদ ﷺ-এর খেদমতের জন্য দিয়ে দিলেন। কিন্তু দয়ার সাগর, সর্বমানবতার মুক্তিদূত, রাহমাতুল্লিল আলামীন তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন। এমনকি আপন পালক পুত্র হিসেবে তাকে গ্রহণ করলেন। রাসূল ﷺ-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়েদ ইসলাম কবুল করলেন এবং অচিরেই নিজেকে কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুললেন।

যায়েদের সাথে যয়নবের বিয়ে : এ ক্রীতদাস যায়েদ (রা)-এর সাথে রাসূল ﷺ-এর আপন ফুফাতো বোন অনিন্দ্য সুন্দরী যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর বিয়ে দেন। রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা। সব মুসলমান সমান, সকলে ভাই ভাই, আশরাফ-আতরাফের কোনো বালাই ইসলামে নেই। ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তিনি একজন সদ্য আযাদপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের সাথে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ, কুরাইশ বংশের মেয়ে তাও আবার নিজেরই ফুফাতো বোনকে বিয়ে দেন।

কিন্তু নারীসুলভ মানসিকতার কারণে যয়নব (রা) এ বিয়েকে ভালো মনে মেনে নিতে পারেননি। যে কারণে বিয়ের প্রায় এক বছর একত্রে বসবাস করার পরও তাদের মধ্যে সার্বিক অর্থে কোনো ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। ফলে যায়েদ (রা) প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। আসলে যয়নব (রা) বিয়ের আগেই রাসূল ﷺ-এর খেদমতে যায়েদ (রা) সম্বন্ধে আরজ করেছিলেন, 'আমি তাঁকে আমার জন্য পছন্দ করি না।' তিনি শুধু রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মেনে নেয়ার জন্যই এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন।

শিক্ষা বিষয়ক

١٧. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّهَا ذَكَرَتْ اَوْ كَلِمَةً غَيْرَهَا قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - يَقْطَعُ قِرَائَتَهُ اٰيَةً اٰيَةً -

১৭. আব্দুল্লাহ ইবন আবু মুলায়কা উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ-এর কুরআন পাঠ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ্-এর পর সূরা ফাতিহার প্রথম তিনটি আয়াত উল্লেখ করে বললেন : রাসূলুল্লাহ প্রতি আয়াতে থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন।

(আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৫৬।)

চিকিৎসা বিষয়ক

١٨. عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاٰى فِىْ بَيْتِهَا جَارِيَةً فِىْ وَجْهِهَا سَفْعَةٌ - فَقَالَ : اِسْتَرْقُوْا لَهَا فَاِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ -

১৮. উম্মু সালামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী তাঁর ঘরে এক মেয়েকে দেখলেন, যার চেহারায় কালো কুচকে দাগ পড়ে গিয়েছে। নবী বললেন : দোয়া পড়ে তাতে ফুঁক দাও। কেননা এতে নজর লেগেছে।

এরূপ অনেক গুরুত্বপূর্ণ হাদীস আমরা তাঁর থেকে লাভ করে থাকি।

উম্মু সালামা (রা) অতিশয় লাজুক প্রকৃতির মহিলা ছিলেন। বিয়ের পর রাসূল যখন উম্মু সালামা (রা)-এর ঘরে আসতেন তখন তিনি লজ্জার কারণে মেয়ে যয়নবকে কোলে করে বসে থাকতেন। এ অবস্থা বেশ কিছু দিন বহাল ছিল। তারপর ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন অত্যন্ত আমলদার একজন মহিলা। বিদায় হজ্জের সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। কিন্তু যথার্থ ওজর থাকা সত্ত্বেও যখন তিনি রাসূল-এর সাথে গমন করেন, তখন রাসূল তাওয়াফ সম্পর্কে বললেন, 'উম্মু সালামা, ফজরের সালাত চলাকালে উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তুমি তাওয়াফ করবে।'

দাস প্রথা ও যায়েদ : তৎকালীন আরব সমাজে অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর সাথে বাজারে মানুষও বেচাকেনা হতো। যাদেরকে বাজারে পণ্য সামগ্রীর মতো বেচাকেনা করা হতো তারা ক্রীতদাসরূপে পরিচিত ছিল। নবুওয়্যাতের পূর্বে ও সূচনালগ্নেও এ প্রথা চালু ছিল। পরবর্তীকালে রাসূল ﷺ খোলাফায়ে রাশেদা, সাহাবাগণ ও পরবর্তীকালের মুসলিম শাসকগণ ধীরে ধীরে এ কু-প্রথার বিলুপ্তি সাধন করেন।

সেই জাহেলী যুগের প্রথা অনুযায়ী খাদীজা (রা)-এর ভাতিজা হাকীম ইবনে খুযাইমা বাজার থেকে যায়েদ ইবনে হারিসা নামের এক দাস বালককে কিনে এনে ফুফুকে উপহার হিসেবে দিলেন। পরবর্তীতে খাদীজা প্রিয় দাস যায়েদকে স্বামী মুহাম্মদ ﷺ-এর খেদমতের জন্য দিয়ে দিলেন। কিন্তু দয়ার সাগর, সর্বমানবতার মুক্তিদূত, রাহমাতুল্লিল আলামীন তাকে আযাদ (মুক্ত) করে দিলেন। এমনকি আপন পালক পুত্র হিসেবে তাকে গ্রহণ করলেন। রাসূল ﷺ-এর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যায়েদ ইসলাম কবুল করলেন এবং অচিরেই নিজেকে কুরআন হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুললেন।

যায়েদের সাথে যয়নবের বিয়ে : এ ক্রীতদাস যায়েদ (রা)-এর সাথে রাসূল ﷺ-এর আপন ফুফাতো বোন অনিন্দ্য সুন্দরী যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর বিয়ে দেন। রাসূল ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের মধ্যে সমতা ফিরিয়ে আনা। সব মুসলমান সমান, সকলে ভাই ভাই, আশরাফ-আতরাফের কোনো বালাই ইসলামে নেই। ইসলামের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই তিনি একজন সদ্য আযাদপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের সাথে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ, কুরাইশ বংশের মেয়ে তাও আবার নিজেরই ফুফাতো বোনকে বিয়ে দেন।

কিন্তু নারীসুলভ মানসিকতার কারণে যয়নব (রা) এ বিয়েকে ভালো মনে মেনে নিতে পারেননি। যে কারণে বিয়ের প্রায় এক বছর একত্রে বসবাস করার পরও তাদের মধ্যে সার্বিক অর্থে কোনো ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। ফলে যায়েদ (রা) প্রচণ্ড অশান্তির মধ্যে দিনাতিপাত করছিলেন। আসলে যয়নব (রা) বিয়ের আগেই রাসূল ﷺ-এর খেদমতে যায়েদ (রা) সম্বন্ধে আরজ করেছিলেন, 'আমি তাঁকে আমার জন্য পছন্দ করি না।' তিনি শুধু রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ মেনে নেয়ার জন্যই এ বিয়েতে রাজি হয়েছিলেন।

যায়েদ-যয়নব দ্বন্দ্ব : কিন্তু যখন দু'জনের মধ্যে মোটেই বনিবনা হচ্ছিল না তখন একদিন যায়েদ (রা) এসে রাসূল ﷺ-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! যয়নব আমার কথার ওপর কথা বলে তর্ক করে, আমি তাকে তালাক দিতে চাই।' একথা শুনে রাসূল ﷺ যায়েদ (রা)-কে আল্লাহ্‌র ভয় দেখিয়ে তালাক দেয়া থেকে বিরত থাকতে বললেন। কারণ তালাক দেয়া শরীয়তে জায়েয হলেও অপছন্দনীয়। এমন কি বৈধ কাজসমূহের মধ্যে এ কাজটি নিকৃষ্টতম ও সর্বাধিক ঘৃণিত।

যে কারণে রাসূল ﷺ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছ?' যায়েদ উত্তর করলেন 'না!' কিন্তু আমি তার সংগে বসবাস করতে পারবো না।' রাসূল ﷺ তাঁকে আদেশের সুরে বললেন, 'বাড়িতে গিয়ে তোমার স্ত্রীর দেখাশোনা কর, তার সংগে ভালো আচরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর।' কিন্তু তাদের সম্পর্ক এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে শেষ পর্যন্ত যায়েদ (রা) রাসূল ﷺ নিষেধ করার পরও যয়নব (রা)-কে তালাক দিয়ে দেন।

এ বিষয়টি সূরা আহযাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ .

অর্থ : 'হে নবী! সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন তুমি সে ব্যক্তিকে বলেছিলেন যে, যার প্রতি আল্লাহ্‌ এবং তুমি অনুগ্রহ করেছিলে, তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর।' [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৭]

নিরীহ যয়নব : যায়েদ (রা) যখন যয়নব (রা)-কে তালাক দিলেন তখন জনগণের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল, ক্রীতদাসের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কে-ই বা বিয়ে করবে। সত্যি কথা বলতে কি, তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর যয়নব (রা) হয়ে গেলেন অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্রী! এ অবস্থা থেকে যয়নব (রা)-কে রেহাই দিতে আল্লাহ্‌ রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁকে বিয়ে দেয়ার মনস্থ করলেন।

তাই যয়নব (রা) তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর ইদ্দত পুরা হলে রাসূলে করীম ﷺ তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। কিন্তু জাহেলী প্রথা সেখানে বাধা হয়ে

দাঁড়ায়। কারণ যায়েদ (রা) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর পালক পুত্র। তৎকালীন আরবের লোকজন পালক পুত্রকে আপন পুত্রের মতই মনে করত। যায়েদ (রা) ঐ সময়ে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ ﷺ নামেই পরিচিত ছিলেন। ফলে রাসূল ﷺ অপবাদের আশংকা করছিলেন। তাছাড়া মুনাফিকদের তর্জন গর্জনও ছিল।

কুপ্রথার মূলৎপাটনে আয়াত নাযিল : যা হোক, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চাচ্ছিলেন সকল প্রকার কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করে নির্ভেজাল একটি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাসূল ﷺ-কে দুনিয়াতে প্রেরণ করেন। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবকিছু নিরসনকল্পে ঘোষণা করলেন–

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ـ

অর্থ : 'তোমাদের পুরুষদের মধ্যে মুহাম্মদ ﷺ কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৪০]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও ঘোষণা করেন–

وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ ج وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشٰهُ ـ

'তুমি অন্তরে তা গোপন করছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, তুমি মানুষকে ভয় করছ, অথচ আল্লাহ্‌ই তো বেশি ভয় পাওয়ার যোগ্য।'

[৩৩–আহযাব : ৩৭]

বিয়ের প্রস্তাব যায়েদ কর্তৃক : রাসূল ﷺ নিশ্চিন্ত হলেন। এরপর তিনি যায়েদকেই পাঠালেন বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যয়নব (রা)-এর কাছে। তিনি যয়নব (রা)-এর গৃহে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তোমাকে বিয়ে করতে চান।' তিনি বললেন, 'এটা খুব ভালো কথা। তবে ইস্তেখারা করে সিদ্ধান্ত নেব।' তিনি ইস্তেখারায় বসে গেলেন। ইতোমধ্যেই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূল ﷺ ও যয়নব (রা)-এর বিয়ের ব্যাপারে আয়াত নাযিল হলো–

فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىٓ اَزْوَاجِ اَدْعِيَآئِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ؕ وَكَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا ـ

অর্থ: 'অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে স্বীয় প্রয়োজন সমাপ্ত করল তখন আমি তাঁকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম। যাতে প্রয়োজন পুরো করার পর মুখ ডাকা পুত্রের স্ত্রীদের ব্যাপারে মু'মিনদের ওপর কোনো দোষারোপ না চলে। আল্লাহ্র ইচ্ছে তো পূরণ হবেই।' [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৩৭]

সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে, 'তখন আমি তাঁকে তোমার নিকট বিয়ে দিলাম।' এমন কথা নাযিল হওয়ার পর বিয়ের কাজ সম্পন্ন করা হল। সময়টা ছিল ৫ম হিজরীর জিলক্বদ মাস। এ জন্যেই যয়নব (রা) গর্ব করে বলতেন, 'আমার বিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ দিয়েছেন।'

বিয়ের অনুষ্ঠান : এ বিয়েতে বেশ আনন্দ করা হয়। বৌভাত অনুষ্ঠানে আনসার ও মুহাজিরদের প্রায় তিনশ জনকে দাওয়াত করা হয়। খাওয়ার মেনু ছিল গোশত-রুটি। একেক বারে দশজন করে লোক খেতে বসছিলেন। কিন্তু শেষ দলের লোকজন খাওয়া শেষ হওয়ার পরও বসেছিলেন। তারা নানা গল্পে মেতে উঠলেন। ফলে রাত ক্রমেই গভীর হতে লাগল।

পর্দার আয়াত : রাসূল ﷺ লজ্জার কারণে মেহমানদেরকে উঠতে বলতে পারছিলেন না, অথচ খুব অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। ঠিক এ সময়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পর্দার আয়াত নাযিল হয়। ইরশাদ হচ্ছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ ۙ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَامُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ؕ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْيٖ مِنْكُمْ ۫ وَاللّٰهُ لَايَسْتَحْيٖ مِنَ الْحَقِّ ؕ وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ـ

অর্থ : 'হে ঈমানদার লোকেরা! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা নবী গৃহে প্রবেশ করবে না। অবশ্য দাওয়াত পেলে যাবে, তবে ডাকার আগে গিয়ে অনর্থক বসে থাকবে না। বরং ডাকবার পরে যাবে, খাওয়ার পরে চলে আসবে। বসে গল্প-গুজবে রত হবে না। নিশ্চয় এটা নবীর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদেরকে বলতে সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু আল্লাহ্ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। তোমরা নবীর স্ত্রীদের নিকট কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে।' [সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৫৩]

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ দরজায় পর্দা ঝুলিয়ে দেন। ফলে লোকদের ভেতরে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

রাসূল ﷺ ও যয়নব (রা)-এর বিয়ের ফলে আরবের দীর্ঘদিনের প্রচলিত একটি ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে, তা হল-পালক পুত্র আদৌ আপন পুত্র হতে পারে না। ফলে তার স্ত্রীকে বিয়ে করাও দোষণীয় নয়। ইসলাম পরিষ্কারভাবে ১৪ জন নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে। বাকি সকলকে বিয়ে করা জায়েয। এ ১৪ জনের মধ্যে পালক পুত্রের স্ত্রীর কথা নেই।

বিয়ের বৈশিষ্ট্য : এ বিয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তা হল–

১. জাহেলী যুগে পালক পুত্র আসল পুত্রের মর্যাদাসম্পন্ন ছিল। এ প্রথার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।

২. লোকদেরকে আদেশ করা হয় যে, কাউকে তার প্রকৃত পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে পিতৃ পরিচয়ে সম্পর্ক করা যাবে না।

৩. মানুষের মধ্যে উঁচু-নীচুর কোনো ব্যবধান থাকবে না।

৪. আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে যয়নব (রা)-এর বিয়ে দেন।

৫. যয়নবের সাথে বিয়ের সময় পর্দার আয়াত নাযিল হয় এবং পর্দা প্রথার প্রচলন হয়।

৬. একমাত্র যয়নবের বিয়েতেই জাঁকজমকপূর্ণভাবে অলিমা অনুষ্ঠান করা হয়।

শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে জয়নব (রা) ছিলেন ক্ষুদ্রকায় কিন্তু সুন্দরী ছিলেন। সাথে সাথে শোভন শারীরিক গঠন ছিল তাঁর।

চরিত্র মাধুর্য : তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার, পরহেযগার, উদার, দয়ার্দ্রচিত্ত, বিনয়ী ও সৎ স্বভাবী ছিলেন। আর তিনি ছিলেন পরিশ্রমী একজন মহিলা। তিনি হস্তশিল্পের

কাজে খুবই পারদর্শী ছিলেন। তিনি নিজ হাতে রোজগার করে সংসার চালাতেন। তাঁর পরহেযগারিতার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। একবার সাহাবীদের মধ্যে রাসূল ﷺ কিছু মাল বিতরণ করছিলেন। কিন্তু স্ত্রী যয়নবের পরামর্শক্রমে তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখেন। এতে ওমর (রা) রাগ করে যয়নবকে ধমক দিলে রাসূল ﷺ বলেন, 'ওমর! যয়নবকে কিছু বলো না। সে খুবই আল্লাহ্ ভীরু ও ইবাদতের সময় ক্রন্দনশীলা।'

একবার ওমর (রা) বায়তুল মাল থেকে যয়নবকে এক বছরের খরচ পাঠিয়ে দেন। যয়নব (রা)-এর সামান্য অংশ একটি চাদরে ঢেকে রেখে বাকি সমস্ত কিছু গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার জন্য পরিচারিকাকে নির্দেশ দেন। এ সময় পরিচারিকা আরজ করলেন, আম্মাজান! গরীবদের মাঝে আমিও একজন। সুতরাং এ মাল থেকে আমিও কিছু পেতে পারি। বিবি যয়নব বললেন, চাদরে ঢাকা যা আছে সবই তোমার, বাকিগুলো তুমি দান করে দাও।'

সব কিছু দান করার পর তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে আরজ করলেন, 'ইয়া রাব্বাল আলামীন! বায়তুল মাল থেকে দান যেন আর আমাকে গ্রহণ করতে না হয়।' তাঁর এ মুনাজাত কবুল হয় অর্থাৎ ঐ বছরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য : যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) ছিলেন আত্মমর্যাদা সম্পন্না মহিলা। মুহাম্মদ ইবনে ওমর বর্ণনা করেন যে, 'একদিন যয়নব (রা) নবীজীকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার অন্য স্ত্রীদের মতো নই। তাঁদের মধ্যে একজনও এমন নেই, যার বিয়ে পিতা-ভাই বা বংশের অন্য কারো অভিভাবকত্বে সম্পন্ন হয়নি। একমাত্র আমিই ব্যতিক্রম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে আসমান থেকে আপনার স্ত্রী করেছেন।'

আয়েশা (রা) বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً قَطُّ فِي الدِّيْنِ مِنْ زَيْنَبَ ـ

'আমি দ্বীনের ব্যাপারে যয়নব (রা) থেকে উত্তম কোনো মহিলা দেখিনি।'

(আল-ইসতীয়াব-২/৭৫৪)

মূসা ইবনে তারেক যয়নব (রা) সম্পর্কে আয়েশা (রা) থেকে উদ্ধৃত করে বলেন, 'দ্বীনদারী, তাকওয়া, সত্যবাদিতা, আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি, দানশীলতা এবং আত্মত্যাগে তাঁর চেয়ে উত্তম মহিলা আর কেউ ছিল না।'

আয়েশা (রা) তাঁর সম্বন্ধে আরও বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'আলা যয়নব বিনতে জাহাশের প্রতি রহম করুন। সত্যি দুনিয়ায় তিনি অনন্য মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীর সাথে তাঁকে বিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

তাঁর সম্বন্ধে উম্মু সালামা (রা) বলেন–

كَانَتْ صَالِحَةً صَوَّامَةً قَوَّامَةً ـ

'তিনি ছিলেন অতি নেককার, অধিক সিয়াম পালনকারী এবং অতি ইবাদতকারী।'

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) মর্যাদা সম্পন্ন মহিলা সাহাবী ছিলেন। বিভিন্ন কর্মের পাশাপাশি তিনি অল্প পরিমাণে হলেও নবী ﷺ থেকে হাদীস শিক্ষা ও তা বর্ণনা কার্যেও অবদান রেখেছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে ১১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার (র) আল-ইসাবা গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, যয়নব (রা) নবী ﷺ থেকে কতিপয় হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাদীস পুনরুক্তিসহ বুখারীতে ৫টি, মুসলিমে ৩টি, তিরমিযীতে ২টি, আবু দাউদে ২টি, নাসাঈতে ২টি ও ইবনে মাজায় ২টি সংকলিত হয়েছে।

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

١. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رض) اَنَّهَا قَالَتْ : اِسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَّجْهُهُ يَقُوْلُ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اِقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمُ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلَ هٰذِهٖ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيْنَ اَوْ مِائَةً ـ قِيْلَ : اَنُهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ قَالَ : نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ ـ

১. যয়নব বিনত জাহাশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : নবী ﷺ একদা রক্তিম বর্ণের চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি বললেন : আল্লাহ

ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আরবদের জন্য বিপদ সমাগত। ইয়া'জূজ-মা'জুজ এর প্রাচীরের ছিদ্র আজ এ পর্যন্ত উন্মুক্ত করে ফেলা হয়েছে (বর্ণনাকারী সুফিয়ান) তাঁর হাতের আঙ্গুল দিয়ে ৯০ বা ১০০-এর আকৃতি করে দেখালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো– আমরাও কি ধ্বংস হয়ে যাবো অথচ আমাদের মাঝে পুণ্যবানগণ রয়েছে? নবী ﷺ বলেলেন : হ্যাঁ, যখন অন্যায় অধিক হবে, তোমরাও ধ্বংস হয়ে যাবে। (মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ.–৩৮৮)

٢. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رض) قَالَتْ : قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَنَا مُسْتَحَاضَةٌ فَقَالَ : تَجْلِسُ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْهِمَا وَتُوَخِّرِ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ.

২. যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ কে বললাম, যে, আমি ইস্তিহাযা (অনিয়ন্ত্রিত স্রাব)-এ আক্রান্ত। নবী ﷺ বললেন : তুমি তোমার পূর্ব নির্ধারিত হায়েযর দিনগুলোতে অপেক্ষা করবে। অতঃপর গোসল করে যোহরকে বিলম্ব করত আসরকে তাড়াতাড়ি করবে। অতঃপর গোসল করে উভয় ওয়াক্ত সালাত পড়বে। অনুরূপ মাগরিবকে বিলম্ব করে এশা কে এগিয়ে এসে গোসল করে উভয় সালাত একত্রে পড়বে। আর ফজরের জন্যও আলাদা গোসল করবে। (সুনানে নাসাই ১ম খণ্ড পৃ.–৬৫-৬৬)

٣. عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رضى) اَنَّهُ كَانَ لَهَا مَخْضَبٌ مِّنْ صَفْرٍ. قَالَتْ : كُنْتُ اُرَجِّلُ رَاْسَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِ.

৩. যয়নব বিনত জাহাশ (রা) হতে বর্ণিত। তাঁর হলুদ রঙের একটি চিরুনী ছিল যা দ্বারা তিনি রাসূল ﷺ-এর মাথা চিরুনী করে দিতেন। (সুনান ইবনে মাজাহ)

৪. যয়নব বিনতে আবূ সালাম (রা) বলেন : তিনি যয়নব বিনত জাহাশের (রা) নিকট আসলে তিনি বললেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য বৈধ নয়

মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করতে পারে।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে ছিলেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবন জাহাশ (তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র), উম্মু হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান, যয়নব বিনতে আবু সালামা, কুলছুম বিনতুল মুসতালাক (র) প্রমুখ সাহাবী ও তাবেঈদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ওফাত : হিজরী ২০ সালে ওমর (রা)-এর শাসন আমলে ৫৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় শুধু একটি মাত্র গৃহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাঁর স্মৃতি চিহ্ন এ গৃহটি উমাইয়া খলীফা ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালেক ৫০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের নিকট থেকে ক্রয় করে মসজিদে নববীর আন্তর্ভুক্ত করেন।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর কাফনের কাপড় তৈরি করে যান। এ ব্যাপারে তিনি অসিয়ত করেন যে, 'ওমর আমার জন্য কাপড় পাঠাতে পারে। এমন হলে এক প্রস্থ কাপড় ছদকা করে দেবে।'

তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী রাসূলে করীম ﷺ-এর খাটে করে তাঁকে দাফন করতে নিয়ে যাওয়া হয়। এ খাটে করে আবূ বকর (রা)-এর লাশও বহন করা হয়। তবে আবূ বকর (রা)-এর পর যাদের লাশ বহন করা হয়, তাদের মধ্যে যয়নব (রা) ছিলেন প্রথম মহিলা।

ওমর (রা)-এর নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসামা ইবনে যায়েদ, আবদুল্লাহ ইবনে আবু আহমদ ইবনে জাহাশ এবং মুহাম্মদ ইবনে তালহা তাঁর লাশ কবরে নামান। এঁরা সবাই ছিলেন যয়নব (রা)-এর নিকটাত্মীয়।

আয়েশা (রা) তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে বলেছিলেন, 'ভাগ্যবতী অনন্য মহিলা বিদায় নিয়েছেন। এতীমরা হয়ে পড়েছে অস্থির ব্যাকুল। তিনি ছিলেন এতীমদের আশ্রয়স্থল।'

ওমর (রা) তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। আকীল এবং হানাফিয়ার কবরের মধ্যস্থলে তাঁর কবরের অবস্থান। তাঁর দাফন করার দিন প্রচণ্ড গরম পড়েছিল। এজন্য ওমর (রা) সেখানে তাঁবু গাড়েন। জানা যায় কবর খননের জন্য জান্নাতুল বাকীতে এটা ছিল প্রথম তাঁবু।

৮. উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া (রা)

ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আমি হারেস ইবনে আবূ দিদারের কন্যা। আমার পিতা গোত্রের সরদার, আমি কি বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়।

নাম ও পরিচয় : নাম জুয়াইরিয়া। পূর্ব নাম ছিল বাররা। রাসূল ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখেন জুয়াইরিয়া। আব্বার নাম হারেস। তিনি বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দার ছিলেন। তাঁর বংশ তালিকা হল, জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস ইবনে আবু দিদার ইবনে হাবীব ইবনে আয়েয ইবনে মালেক ইবনে জুয়াইমা ইবনে আসাদ ইবনে আমর ইবনে রাবীয়া ইবনে হারিসা ইবনে আমর মুযিকিয়া।

প্রথম বিবাহ : জুয়াইরিয়া (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল তাঁর নিজের গোত্রের মুসাফা ইবনে সাফওয়ান মুসতালেফীর সাথে। মুসাফা সম্পর্কে জুয়াইরিয়া (রা)-এর চাচাত ভাই ছিলেন। তিনি ইবনে যিয়ার নামেও পরিচিত ছিলেন।

প্রথম দিকে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রু : জুয়াইরিয়া (রা)-এর পিতা এবং স্বামী দু'জনই ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন। কুরাইশদের প্ররোচনায় অথবা নিজেদের ইচ্ছায় তারা মদীনার ওপর আক্রমণ করার পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। সংবাদটি রাসূল ﷺ-এর কানে পৌছলে তিনি এর সত্যতা যাচাই-এর জন্য বুরাইদা ইবনে হাবীব আসলামীকে ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। বুরাইদা ফিরে এসে সংবাদটি সত্য বলে জানালে রাসূল ﷺ তাঁর বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং মুরাইসী নামক স্থানে অবস্থান নেন। এ মুরাইসী নামক স্থানটি মদীনা থেকে নয় মাইল দূরে। আর সময়টি ছিল হিজরী ৫ম সনের শাবান মাস।

বনী মুস্তালিক যুদ্ধ : ওদিকে মুসলমান বাহিনীর আগমন, অবস্থান গ্রহণ ও রণসজ্জার খবর শুনে মুস্তালিক গোত্র প্রধান জুয়াইরিয়া (রা)-এর পিতা হারেস তাঁর সংগঠিত বাহিনী থেকে সটকে পড়েন। কিন্তু তাঁর বাহিনীর মনোবল ছিল অটুট। হারেসের অধীনস্থ বাহিনী কিছুমাত্র পিছু না হটে মুসলিম বাহিনীর সাথে

মরণপণ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়। প্রচণ্ড যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা গেল মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করেছে। এ যুদ্ধে বনী মুস্তালিক গোত্রের এগার জন নিহত হয় ও ছয়শত সেনা মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। আর দুই হাজার উট ও পাঁচ হাজার ছাগলও মুসলমানদের দখলে আসে। এ যুদ্ধে জুয়াইরিয়ার স্বামী নিহত হন।

উক্ত যুদ্ধবন্দীদের সাথে বন্দী অবস্থায় গোত্র প্রধান হারেসের কন্যা জুয়াইরিয়াও ছিলেন। তৎকালীন আরবের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদেরকে গোলাম হিসেবে বিলি বণ্টন করা হতো। সে মুতাবেক জুয়াইরিয়া সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েন। পূর্বেই বলেছি জুয়াইরিয়া ছিলেন গোত্র প্রধানের কন্যা। যে কারণে তিনি দাসীর জীবন মেনে নিতে পারছিলেন না। সে জন্য তিনি সাবিত (রা)-এর কাছে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির আবেদন জানান। সাবিত (রা) ১৯ উকিয়াহ স্বর্ণের বিনিময়ে এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

রাসূল ﷺ জুয়াইরিয়ার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় ও তাকে বিবাহ করা : কিন্তু জুয়াইরিয়ার কাছে এত বিপুল স্বর্ণ বা সম্পদ না থাকার কারণে তিনি এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য স্বয়ং রাসূল ﷺ-এর নিকট আবেদন করেন। এ ঘটনাটি আয়েশা (রা) এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ বন্দীদেরকে বণ্টন করলে জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েন। জুয়াইরিয়া তৎক্ষণাৎ মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি লাভের উদ্যোগ নেন। তিনি ছিলেন খুবই লাবণ্যময়ী মিষ্টি মেয়ে। তাঁকে যে-ই দেখতো সে মুগ্ধ হয়ে যেত। জুয়াইরিয়া মুক্তিলাভের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে সাহায্য কামনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! আমি হারেস ইবনে আবূ দিদারের কন্যা।

আমার পিতা গোত্রের সরদার, আমি কি বিপদে পড়েছি তা আপনার অজানা নয়। আমি সাবিত ইবনে কায়েসের ভাগে পড়েছি। আমার মুক্তিপণ আদায়ে আপনার সাহায্য কামনা করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যদি তোমার জন্য আরো ভালো কিছুর ব্যবস্থা করি? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! সেটা কি? তিনি বললেন, আমি তোমার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় করে দিয়ে তোমাকে বিয়ে করব। জুয়াইরিয়া বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি এতে রাজি আছি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি তাই করলাম।

মুসলমানগণ যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করেছেন তখন তারা তাদের হাতে বন্দী বনু মুস্তালিকের সব লোককে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয় বিবেচনা করে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে বনু মুস্তালিকের ছয়'শ বন্দী শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে জুয়াইরিয়ার বিয়ে হওয়ার কারণে মুক্তি লাভ করল। সত্যি বলতে কি নিজ গোত্রের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়েছে এমন কোন মহিলার কথা আমার জানা নেই।'

জুয়াইরিয়ার পিতার ইসলাম গ্রহণ : অন্য একটি বর্ণনা এরূপ– ইবনে আসীর (রা) বলেন, 'জুয়াইরিয়ার বাবা যখন জানতে পারলেন যে, তার কন্যা বন্দী হয়ে আছে, তখন তিনি অনেক সম্পদ ও আসবাবপত্র কয়েকটি উটের ওপর বোঝাই করে কন্যার মুক্তির জন্য মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে পছন্দনীয় দু'টি উট 'মাফিক' নামক স্থানে লুকিয়ে রেখে অবশিষ্ট উট ও আসবাব নিয়ে রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, 'আপনি আমার কন্যাকে বন্দী করে এনেছেন। এসব মাল ও আসবাবপত্র নিন, বিনিময়ে আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দিন।'

রাসূল ﷺ বললেন, 'যে দু'টি উট তুমি লুকিয়ে রেখে এসেছ তা কোথায়?' রাসূল ﷺ-এর কথা শুনে হারেস আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং তখনই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর কন্যা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তখন তিনি সীমাহীন খুশি হন এবং কন্যার সাথে সাক্ষাৎ করে গৃহে ফিরে যান।

রাজনৈতিক কারণে বিয়ে : মূলত রাসূল ﷺ এ বিয়েটা করেছিলেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। একটু চোখ-কান খুলে বিয়ের বিষয়টা দেখলেই পরিষ্কার হয় যে, বিয়েটা ছিল রাজনৈতিক দূরদর্শীতার এক মাইলফলক। এ বিয়ের ফলে রাসূল ﷺ ও মুসলমানগণ কূটনৈতিকভাবে বিজয় লাভ করেন। কারণ বনু মুস্তালিক গোত্রের সকল মানুষ ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শত্রু। তারা কোনো প্রকারেই রাসূল ﷺ ও মুসলমানদের মেনে নিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল ﷺ জুয়াইরিয়াকে বিয়ে করার ফলে বনু মুস্তালিকের সকল যুদ্ধ বন্দী বেকসুর মুক্তি লাভ করে। ফলে হঠাৎ করেই প্রাণের দুশমন বন্ধুতে পরিণত হয়। বনু মুস্তালিক গোত্রের কেউ আর কোনোদিন রাসূল ﷺ ও

মুসলমানদের বিরোধিতা করেনি। এমন কি তারা ধীরে ধীরে সকলেই ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

জুয়াইরিয়ার ব্যক্তি সত্ত্বা : জুয়াইরিয়া (রা) ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও স্বাধীনচেতা মহিলা। যে কারণে তিনি বন্দী জীবন সহ্য করতে পারেননি। তিনি দেখতে ছিলেন সুন্দরী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তাঁর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আয়েশা (রা) বলেন, 'জুয়াইরিয়া দেখতেই শুধু সুন্দরী ছিলেন না, বরং তাঁর অনুপম চেহারায়, চিত্তাকর্ষক এবং মধুর আচরণে এমন এক মাধুর্য নিহিত ছিল, যাতে করে যে কোনো লোক তাঁর সান্নিধ্যে আসত, সে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বিমুগ্ধ ও আকৃষ্ট হয়ে যেত। তাঁকে দেখলেই দর্শকের মনে একটা স্থায়ী মমতার চিহ্ন ফুটে উঠতো।'

জুয়াইরিয়া (রা) একজন ইবাদত গুজার মহিলা ছিলেন। জানা যায়, তিনি প্রায় সার্বক্ষণিকভাবেই ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। একদিন রাসূল ﷺ তাঁর ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন জুয়াইরিয়া তাসবীহ্ পাঠ করছেন। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কি সব সময় এ আমল কর?' তিনি উত্তর দিলেন, 'জি হ্যাঁ।'

একদিন ভোরে জুয়াইরিয়া (রা) মসজিদে বসে দোয়া করছিলেন। এ অবস্থায় রাসূল ﷺ তাঁকে দেখলেন এবং চলে গেলেন। দুপুরে ফিরে এসে রাসূল ﷺ তাঁকে সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন।

ইবনে সা'আদ বর্ণনা করেন যে, জুমু'আর দিন নবীজী জুয়াইরিয়ার কাছে যান। সেদিন তিনি সিয়াম পালনরত ছিলেন। নবীজী যেহেতু একটা রোযা রাখাকে মাকরূহ মনে করতেন, তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি গতকাল সিয়াম রেখেছিলে?' বললেন, 'না। নবীজী পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আগামীকাল রাখবে? বললেন, না। নবীজী বললেন, তাহলে সিয়াম ভেঙ্গে ফেল।

রাসূল ﷺ জুয়াইরিয়াকে খুব ভালোবাসতেন। একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে খাবার কিছু আছে কি? জুয়াইরিয়া বললেন, আমার এক দাসী ছদকার কিছু গোশত দিয়েছে, তাই আছে। এ ছাড়া আপাতত অন্য কিছু নেই। রাসূল ﷺ বললেন, তাই নিয়ে এসো। কারণ, যাকে ছদকা দেয়া হয়েছে, তার কাছে তা পৌঁছেছে।'

হাদীস বর্ণনায় তাঁর অবদান

এ পুণ্যবতী মহিলা রাসূল ﷺ থেকে অল্প কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, জাবের, আবূ আইয়ুব মারাসী, তোফায়েল, মুজাহিদ, কুলছুম ইবনে মুসতালিক, কুরাইব এবং আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুযুর্গ মহিলা সাহাবী। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তিনি ৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী একটি ও মুসলিম ২টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

١. إِنَّ عُبَيْدَ بْنِ السَّبَّاكِ قَالَ : إِنَّ جُوَيْرِيَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ : هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ قَالَتْ : لاَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ . مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلاَّ عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُتَيْتُهُ مَوْلاَتِىْ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : قَرِّبِيْهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا .

১. উবাইদা ইবনে সাববাক (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী জুয়াইরিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর কাছে এসে বললেন : তোমার কাছে কোন খাবার আছে কি? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার দাসীকে দেয়া সাদকার বকরীর কিছু গোশত ছাড়া আমাদের কাছে আর কিছুই নেই। নবী ﷺ বললেন : তাই নিয়ে এসো, কারণ সাদকা তার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গিয়েছে। (মুসলিম)

٢. عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ (رضى) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِيْنَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِىَ فِىْ مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحٰى وَهِىَ جَالِسَةٌ . قَالَ : مَا زَلْتَ عَلَى الْحَالِ حَتّٰى

فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ : نَعَمْ ـ قَالَ النَّبِيُّ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْوُزِنَتْ بِمَا قُلْتُ مُنْذُ الْيَوْمَ لَوَزَنَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضٰى نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ

২. ইবনে আব্বাস (রা) জুয়াইরিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : নবী করীম ﷺ একদা খুব ভোরে ফজরের সালাত পড়ে তাঁর নিকট থেকে বের হলেন। আর তিনি তখন তাঁর সিজদার স্থানেই ছিলেন। অত:পর নবী করীম ﷺ দুপুর বেলায় ফিরে এসে দেখেন তিনি সিজদার স্থানেই বসা। নবী করীম ﷺ বললেন : তোমাকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছি সে অবস্থায় আছ। তিনি বললেন, হ্যাঁ। নবী করীম ﷺ বলেছেন : নিম্নের এ চার শব্দের দোয়া টি যদি তুমি তিনবার করে বলতে তা হলে এ যাবৎ তুমি যা বলেছ তার সাথে এটা ওযন করা যেত।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَ رِضٰى نَفْسِهِ وَ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ـ (মুসলিম)

٣. عَنْ جُوَيْرِيَةَ (رضى) قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيْرٍ اَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ

৩. জুয়াইরিয়া (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে আগুনের পোশাক পরাবেন। (মুসলিম)

ওফাত : আমীর মু'আবিয়ার শাসনামলে ৬৫ বছর বয়সে জুয়াইরিয়া (রা) ইন্তেকাল করেন। সময়টা ছিল হিজরী ৫০ সালের রবিউল আউয়াল মাস। মদীনার তৎকালীন গর্ভনর মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর জানাযার সালাত পড়ান। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়।

৯. উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা)

একদা আবূ সুফিয়ান যখন মেয়ের গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় বসতে যান তখন উম্মে হাবীবা তা উল্টে দেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আবূ সুফিয়ান খুব অপমানবোধ করেন এবং বলেন, 'তুমি এ বিছানায় নিজের পিতাকেও বসতে দিবে না?' উম্মে হাবীবা বললেন, 'একজন মুশরিক রাসূল ﷺ-এর বিছানায় বসুক অবশ্যই আমি তা পছন্দ করি না।'

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উম্মু হাবীবা (রা)-কে বিয়ে করেন তখন নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল হয়–

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً ـ

অর্থ : যারা তোমাদের শত্রু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সম্ভবতঃ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। (সূরা–৬০ মুমতাহিনা : আয়াত-৭)

নাম ও পরিচয় : তাঁর আসল নাম রামলা। কারো কারো মতে 'হিন্দ'। ডাক নাম উম্মু হাবীবা। পিতার নাম আবূ সুফিয়ান। মাতার নাম সুফিয়া বিনতে আবূল আস। তিনি ওসমান (রা)-এর ফুফু ছিলেন। অর্থাৎ ওসমান (রা) ছিলেন উম্মু হাবীবা (রা)-এর আপন ফুফাতো ভাই। উম্মু হাবীবাহ্ নবুওয়্যাতের ১৭ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ : তাঁর বংশ তালিকা হল, রামলা বিনতে আবূ সুফিয়ান সখর ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস। পিতা-মাতা উভয়েই কুরাইশ বংশের লোক ছিলেন। পিতা আবূ সুফিয়ান তো ছিলেন ইসলামের প্রধান শত্রু এবং বিখ্যাত কুরাইশ নেতা।

প্রথম বিবাহ : তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ সুন্দরীদের অন্যতম ছিলেন। যে কারণে পিতা আবূ সুফিয়ান গর্ব করে বলতেন, 'আমার নিকট রয়েছে সারা আরবের শ্রেষ্ঠ

সুন্দরী লাবণ্যময়ী নারী (উম্মু হাবীবা)।' আবূ সুফিয়ান তাই অনেক দেখাশোনা, খোঁজ খবরের পর বনু আসাদ গোত্রের সুদর্শন পুরুষ ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সাথে উম্মু হাবীবার বিয়ে দেন। ওবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি উম্মুল মু'মিনীন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-এর ভাই ছিলেন।

ইসলাম গ্রহণ : নবুওয়্যাতের প্রথম যুগেই উম্মু হাবীবাহ ও স্বামী ওবায়দুল্লাহ ইসলাম কবুল করেন। মক্কায় কাফেরদের অত্যাচারে টিকতে না পেরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে হাবশায় হিজরত করেন। এই হাবশাতেই তাঁদের কন্যা হাবীবা জন্মগ্রহণ করেন। এ হাবীবার নামেই তাঁকে উম্মু হাবীবা বলা হয় এবং এ নামেই তিনি পরিচিত হয়ে আছেন।

প্রথম স্বামীর মৃত্যুবরণ : হাবশাতে আসার পর স্বামী ওবায়দুল্লাহর ভেতর ধীরে ধীরে পরিবর্তন দেখা দেয়। ইসলাম গ্রহণের আগে ওবায়দুল্লাহ ছিলেন প্রচণ্ড মদ্যপায়ী। মদ নিষিদ্ধ হলে অন্যান্যদের মত তিনি তা ত্যাগ করেন। কিন্তু হাবশা আসার পর ওবায়দুল্লাহ আবার মদ পান শুরু করেন। উম্মু হাবীবা স্ত্রী হিসেবে তাকে এ পথ থেকে ফেরানোর প্রাণপণ চেষ্টা করেন। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। এক রাতে উম্মু হাবীবা তাঁর স্বামীকে বিভৎস অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন।

এরপর তিনি স্বামীকে ভয় দেখিয়ে সাবধান করার চেষ্টা করেন কিন্তু উল্টো ওবায়দুল্লাহ তাঁকে বলেন, 'উম্মু হাবীবা, ধর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে বুঝলাম, খ্রিস্টবাদের চেয়ে উত্তম কোনো ধর্ম নেই। আমি ইতোপূর্বে মুসলমান হলেও এখন পুনরায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছি।' এরপর উম্মু হাবীবা তাকে তিরস্কার করলেন কিন্তু কিছুই হলো না, সে খ্রিস্টান হয়ে গেল এবং একদিন মাত্রাতিরিক্ত মদ পান করার কারণে মৃত্যুবরণ করে।

নি:স্ব উম্মু হাবীবা : ওবায়দুল্লাহর মৃত্যুর পর থেকে উম্মু হাবীবা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে যান এবং মানবেতর জীবন যাপন করতে থাকেন। এ সংবাদ রাসূল ﷺ-এর নিকট পৌছলে, ইসলামের জন্য উম্মু হাবীবার ত্যাগের কথা চিন্তা করে তিনি খুবই বিচলিত হন।

রাসূল ﷺ-এর প্রস্তাব : পরে সব দিক বিবেচনা করে বিয়ের প্রস্তাবসহ আমর ইবনে উমাইয়া যাসিরীকে হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর কাছে পাঠান। বাদশাহ নাজ্জাশী নিজের দাসী আবরাহার মাধ্যমে এ প্রস্তাব উম্মু হাবীবার নিকট পৌছান।

প্রস্তাব পেয়ে উম্মু হাবীবা এতই খুশি হন যে, তিনি আবরাহাকে দু'টি রূপার চুড়ি, পায়ের দু'টি মল এবং দু'টি রূপার আংটি উপহার দেন। উম্মু হাবীবা নিজের পক্ষ থেকে খালিদ ইবনে সাঈদকে উকিল নিয়োগ করেন।

বিবাহসম্পন্ন : বাদশাহ্ নাজ্জাশী সন্ধ্যায় স্থানীয় সকল মুসলমান এবং জাফর ইবনে আবূ তালিবকে ডেকে বিবাহ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। বাদশাহর পক্ষ থেকে মোহরানা হিসেবে ৪০০ দেরহাম বা দীনার আদায় করা হয়। উল্লেখ্য যে, এরপর বাদশাহ নাজ্জাশী নিজেই বিয়ে পড়ান। এই বিয়েতে কিছু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

হিজরী ৬ অথবা ৭ সালে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বিয়ের সময় উম্মু হাবীবা (রা)-এর বয়স হয়েছিল ৩৬/৩৭ বছর। বিয়ের পর উম্মু হাবীবা জাহাজ যোগে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। জাহাজ যখন মদীনায় পৌঁছে তখন রাসূল খায়বার অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন এবং সেখানে অবস্থান করছিলেন।

বিয়ে করার কারণ : রাসূল উম্মু হাবীবাকে মূলত দু'টো কারণে বিয়ে করেছিলেন।

প্রথমত, স্বামীর মৃত্যু হওয়ার পর বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে উম্মু হাবীবা প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন। তার কষ্ট ছিল ইসলামের প্রতি মহব্বতের কারণে। তিনি স্বামীর মতোই পুনরায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং স্বামীর এ ধরনের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর এ ত্যাগের পুরস্কার হিসেবে রাসূল তাঁকে বিয়ে করেন।

দ্বিতীয়ত, আবূ সুফিয়ান ছিলেন সে কুরাইশ নেতা যিনি আবূ জেহেলের মৃত্যুর পর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। নবুওয়্যাতের সে প্রথম দিন থেকেই আবূ সুফিয়ান রাসূল ও মুসলমানদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন ও জুলুমের বন্যা প্রবাহিত করেছে। বলা যায়, মানুষের পক্ষে যত প্রকার পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব আবূ সুফিয়ান তার কোনটিই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে ছাড়েনি।

বিয়ের ফলাফল : ইসলাম ও মুসলমানদের এ জাত শত্রুরই কন্যা ছিলেন উম্মু হাবীবা (রা)। এ জন্য রাসূল রাজনৈতিক কারণে সুদূর প্রসারী চিন্তা-ভাবনা করেই উম্মু হাবীবাকে বিয়ে করেন। ঐতিহাসিক ফলও পাওয়া যায়। আবূ সুফিয়ান ক্রমে নরম হতে থাকেন এবং মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম কবুল করেন।

তাঁর ঈমানের বলিষ্ঠতা : উম্মু হাবীবার চরিত্র মাধুর্যে উম্মু হাবীবা (রা) ছিলেন নেককার ও বলিষ্ঠ ঈমানের অধিকারিণী। তিনি ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে কারো সাথে সমঝোতা করতে বা সামান্য দুর্বলতা দেখাতেও রাজি ছিলেন না। এর প্রমাণ তো আমরা তাঁর স্বামী ওবায়দুল্লাহ্ যখন পুনরায় খ্রিস্টান হন তখনই পেয়েছি।

অন্যদিকে তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান একবার মদীনায় আসেন হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়সীমা বাড়ানোর জন্য। তিনি ইচ্ছে পোষণ করছিলেন যে, তাঁর কন্যা উম্মু হাবীবাকে দিয়েই রাসূল ﷺ-এর কাছে আবেদন পেশ করবেন, যাতে সহজেই তা পাস হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি উম্মু হাবীবার গৃহে পদার্পণ করেন।

একদা আবূ সুফিয়ান যখন মেয়ের গৃহে প্রবেশ করে বিছানায় বসতে যান তখন উম্মু হাবীবা তা উল্টে দেন। ঘটনার আকস্মিকতায় আবূ সুফিয়ান খুব অপমানবোধ করেন এবং বলেন, 'তুমি এ বিছানায় নিজের পিতাকেও বসতে দিবে না?' উম্মু হাবীবা বললেন, 'একজন মুশরিক রাসূল ﷺ-এর বিছানায় বসুক অবশ্যই আমি তা পছন্দ করি না।' কন্যার কথা শুনে আবূ সুফিয়ান ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, 'তুমি আমার বিরুদ্ধে খুব বেশি বিগড়ে গেছ।'

উম্মু হাবীবা নিজের পিতার সাথে যে রূঢ় আচরণ করেছিলেন তা শুধুমাত্র ঈমানের তাকিদে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে।

তিনি ছোট খাট ব্যাপারেও খুব গুরুত্ব দিতেন এবং অন্যদেরকেও সে ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন ও তাকিদ দিতেন। একবার তাঁর ভাগিনা আবূ সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ছাতু খেয়ে কুলি না করলে তিনি বললেন, 'তোমার কুলি করা উচিৎ ছিল। কারণ, নবীজী বলেছেন, আগুনে পাকানো জিনিস খেলে অযূ করতে হয়।' একবার তিনি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, প্রতিদিন যে ১২ রাকা'আত করে নফল সালাত পড়লে জান্নাতে তার জন্য ঘর তৈরি করা হবে। এরপর থেকে তিনি আর এ সালাত ছাড়েননি। তিনি নিজেই বলেছেন, অত:পর আমি নিয়মিত বার রাকা'আত সালাত পড়তাম।

তাঁর পিতা আবূ সুফিয়ান ইন্তেকাল করলে তিনদিন পর তিনি খোশবু চেয়ে নিয়ে হাতে মুখে মাখেন এবং বলেন, ঈমানদার নারীর জন্য তিনদিনের বেশি শোক করা জায়েয নেই, অবশ্য স্বামী ছাড়া। স্বামীর জন্য স্ত্রীর শোক করার মেয়াদ হচ্ছে

চার মাস দশ দিন। নবীজীকে একথা বলতে না শুনলে এ ব্যাপারে আমার কোনো খবরই ছিল না।'

প্রথম স্বামী ওবায়দুল্লাহর ঔরসে তাঁর দু'জন সন্তান আবদুল্লাহ ও হাবীবার জন্ম হয়। যতদূর জানা যায় তার আর কোনো সন্তান হয়নি।

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু হাবীবা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) থেকে হাদীস শিক্ষা লাভ করেন এবং পরে তা বর্ণনা করেন। তাঁর থেকে ৬৫টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে দু'টি মুত্তাফাকুন আলাইহি এবং দু'টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে উতবা, সালেম ইবনে সেওয়ার হাবীবা, মু'আবিয়া ওৎবা, আবূ সুফিয়ান, আবদুল্লাহ বিন ওৎবা, সালিম বিন সাওয়াব, আবূল জিরাহ, যয়নব বিনতে আবূ সালামা, সুফিয়া বিনতে সায়বা, ওরওয়া বিন যুবায়ের, শাহার বিন হাওশাব, আবূ সালেহ আস সামান প্রমুখ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পূনরুক্তিসহ সহীহ আল-বুখারীতে ৮টি, সহীহ মুসলিমে ৯টি, জামে' আত তিরমিযীতে ৪টি, সুনান আবু দাউদে ৮টি, নাসাঈতে ৩৪টি এবং ইবনে মাজায় ৮টি সংকলিত হয়েছে।

তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের কয়েকটি প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থ হতে নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

١. عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ اَبِىْ سُفْيَانَ (رضى) لَمَّا جَاءَهَا نَعْىُ اَبِيْهَا دَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ : وَمَا لِىْ بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلاَ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ تَحَدُّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ اِلاَّ عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا -

১. উম্মু হাবীবা বিনতে আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন : যখন তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ তাঁর কাছে আসলো, তিনি সুগন্ধি আনতে বললেন।

অতঃপর তা স্বীয় বাজুতে মাখলেন এবং বললেন : আমার কোন সুগন্ধির প্রয়োজন হতো না, যদি না আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনতাম, তিনি বলেছেন, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন নারীর জন্য বৈধ নয় কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক প্রকাশ করা। তবে স্বামীর মৃত্যুতে চারমাস দশ দিন শোক প্রকাশ করা যায়। (বুখারী ২য় খণ্ড, পৃ.-৮০৪-৮০৫)

٢. عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) تَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ صَلّٰى اِثْنَى عَشَرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهٗ بِهِنَّ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ . قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهِنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২. উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দিবা-রাত্রী বারো রাক'আত সালাত (নফল) পড়বে, জান্নাতে তাঁর জন্য একটি ঘর বানানো হবে। উম্মু হাবীবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ হাদীস শুনার পর আমি কখনও এ সালাত ত্যাগ করিনি।
(মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ.-২৫১)

٣. عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهٗ سَاَلَ اُخْتَهٗ اُمَّ حَبِيْبَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ اِذَا لَمْ يُرَ فِيْهِ اَذًى .

৩. মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) তাঁর বোন উম্মু হাবীবা (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন, যে কাপড় পড়ে নবী কারীম ﷺ স্ত্রী সহবাস করেন, সেই কাপড় পরেই কি তিনি সালাত পড়তেন? উম্মু হাবীবা (রা) বললেন : হ্যাঁ, যখন ঐ কাপড়ে নাপাকীর কোন চিহ্ন দেখা না যেত। (আবু দাউদ, ১ম খণ্ড, পৃ.-৫৩)

٤. عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : كُلُّ كَلَامِ ابْنِ اٰدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهٗ اِلاَّ اَمْرَ بِهَا بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ ذِكْرُ اللّٰهِ .

৪. সাফিয়্যা বিনতে শায়বা (রা) উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন : বনু আদমের প্রতিটি কথাই তার বিপক্ষে যাবে তবে সৎকাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ এবং যিকরুল্লাহ বা আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত। (মুসলিম)

٥. عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ (رضى) أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لَوْلاَ اَنْ أَشُقَّ عَلٰى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ.

৫. উম্মু হাবীবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর না হতো তবে আমি তাদেরকে আদেশ দিতাম প্রতি সালাতে মিসওয়াক করার জন্য।

(মুসলিম : হাদীস নং-৫৮৯)

ওফাত : আপন ভাই আমীর মু'আবিয়ার শাসন আমলে হিজরী ৪৪ সালে ৭৩ বছর বয়সে উম্মু হাবীবা (রা) ইন্তেকাল করেন। মদীনায় তাঁকে দাফন করা হয়। অন্য এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁকে আলী (রা)-এর গৃহে দাফন করা হয়। এর প্রমাণ হলো জয়নুল আবেদীন (রা) তার গৃহ খননকালে একটি শিলা লিপি পান, তাতে লেখা ছিল, এটা রামলা বিনতে সাখর-এর কবর।

মৃত্যুর আগে তিনি আয়েশাকে (রা) ডেকে বলেন, 'আমার এবং আপনার মধ্যে সতীনের মতো সম্পর্ক ছিল। কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন এবং আমার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করবেন। আয়েশা দোয়া করলে তিনি পুনরায় বললেন, আপনি আমাকে খুশি করেছেন, আল্লাহ আপনাকে খুশি করুন।'

১০. উম্মুল মু'মিনীন সফিয়্যা (রা)

খায়বার যুদ্ধ বিজয়ের পর সফিয়্যা (রা) বন্দী হয়ে আসলে এক সময় তাকে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, আমার ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার সময় আমি এই আশা পোষণ করতাম। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ আমাকে আপনার সাহচর্য লাভের যে সুযোগ দিয়েছেন, সে সুযোগ আমি কীভাবে হারাতে পারি?

নাম ও পরিচয় : তাঁর প্রকৃত নাম যয়নব। প্রসিদ্ধ নাম সফিয়্যা। আরবের প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধলব্ধ মাল বন্টনের সময় যে উৎকৃষ্ট বা উত্তম মাল দলপতির জন্য রাখা হতো তাকে সফিয়্যা বলা হতো। খায়বার যুদ্ধে প্রাপ্ত সকল কিছুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন যয়নব। শেষ পর্যন্ত এ যয়নবকে রাসূল ﷺ-এর ভাগে দেয়া হয়। এজন্য তাঁর নামকরণ করা হয় সফিয়া এবং এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল হুওয়াই ইবনে আখতাব। তিনি ছিলেন হারুন ইবনে ইমরান (عليه السلام)-এর অধস্তন পুরুষ।

বংশ : তাঁর বংশ তালিকা হল– যয়নব বিনতে হুওয়াই ইবনে আখতাব ইবনে সাঈদ ইবনে আমের ইবনে ওবাইদ ইবনে কা'আব ইবনুল খাযরাজ ইবনে আবূ হাবীব ইবনে নুছাইর ইবনে নাহহাম ইবনে মাইখুম। তাঁর মায়ের নাম ছিল বাররা বিনতে সামওয়ান। এ সামওয়ান ইয়াহূদীদের সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্র বনু কুরাইযার নেতা ছিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সফিয়্যা (রা)-এর পিতৃকুল নযীর ও মাতৃকুল বনু কুরাইযার ইয়াহূদীদের এক বংশে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

পারিবারিক অবস্থান : সফিয়্যা (রা)-এর আব্বা ও দাদা উভয়েই ছিলেন তৎকালীন ইয়াহূদী জাতির সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। যে কারণে বনী ইসরাঈলের সমস্ত আরবীয় গোত্রের মধ্যে তাদেরকে আলাদা রকম সম্মান করা হতো। বিশেষ করে তাঁর বাবা হুওয়াই ইবনে আখতাবকে মর্যাদার শীর্ষে স্থান

দেয়া হয়েছিল। ইয়াহূদীরা বিনা বাক্যে তাঁর নেতৃত্ব মেনে চলত। তাঁর নানা সামওয়ান মানমর্যাদা শৌর্য-বীর্য এবং বীরত্বের দিক দিয়ে সারা জাযিরাতুল আরবে ছিলেন সম্মানিত। অর্থাৎ সফিয়া (রা) ছিলেন সবদিক দিয়েই বিশিষ্টতার অধিকারিণী।

প্রথম বিবাহ : সফিয়্যা (রা)-এর প্রথম বিয়ে হয় আরবের প্রখ্যাত কবি ও সর্দার সালাম ইবনে মিশকাম আল কারাবীর সাথে। প্রথম দিকে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হলেও পরবর্তীতে মনোমালিন্য ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ফলে সফিয়্যা (রা) পিতৃগৃহে ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় বিবাহ : এরপর কেনানা ইবনে আবূল আফীক-এর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। আবূল আফীক ছিলেন খায়বারের নামকরা দুর্গ আল-কামুদ-এর সর্দার। এ সময় তাঁর বয়স ছিল সতের বছর।

পিতা ও চাচার মৃত্যু : তাঁর পিতা ও চাচা আবূ ইয়াসির রাসূল ﷺ-এর চরম শত্রু ছিল। তারা মদীনা থেকে বিতাড়িত হয়ে চতুর্থ হিজরীতে খায়বারে গিয়ে কিনানা ইবনে আল রাবীর সাথে বসবাস করতে থাকেন। এখানে বসেই হুওয়াই ইবনে আখতাব মুসলমানদের ক্ষতি করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে থাকে।

পরবর্তীতে রাসূল ﷺ-এর নেতৃত্বে খায়বার অভিযানকালে মুসলমানদের হাতে আলকামূস দুর্গের পতন ঘটে। যুদ্ধে ইয়াহূদীদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। বহু নেতৃস্থানীয় ইয়াহূদী মৃত্যুবরণ করে। কেনানা ইবনে আবূল আফীক দুর্গের অভ্যন্তরে নিহত হন। এমন কি তাঁর পিতা হুওয়াই ইবনে আখতাবও নিহত হন। সফিয়্যা অন্যান্য পরিবার-পরিজনদের সাথে বন্দী হন।

বন্দীনী সফিয়্যা : সফিয়্যা বন্দীনী হিসেবে মুসলিম শিবিরে আসার পর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সাহাবী দাহইয়া কলবীর আবেদন মোতাবেক তাঁকে তাঁর ভাগে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু সফিয়্যা (রা) তাঁর মর্যাদার দিক বিবেচনা করে সাহাবী দাহইয়া কালবীর ঘরে যেতে অস্বীকার করেন। এ সময়ে কতিপয় সাহাবী আরজ করেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! সফিয়্যা বনু কুরাইযা এবং বনু নজীরের মহিলা। এ নেতৃস্থানীয়া মহিলাকে দাহইয়ার হস্তে বাঁদী হিসেবে সমর্পণ করলেন? তাঁর মর্যাদা তো অনেক উঁচুতে আসীন। তিনি আমাদের নেতার জন্যই যথোপযুক্ত।'

রাসূল ﷺ সাহাবীদের আবেদন কবুল করলেন এবং দাহইয়া কালবীকে অন্য একজন পরিচারিকা দান করলেন। সফিয়্যাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিলেন।

রাসূলের নিকট আশ্রয় চাওয়া : সফিয়্যা কোথাও যেতে রাজি হলেন না। তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে বিনীত আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! খায়বার যুদ্ধে আমার পিতা এবং স্বামী নিহত হয়েছেন। আমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনরাও যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। আর আমি ইয়াহূদী ধর্ম ত্যাগ করে পবিত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছি। বর্তমানে আমার ইয়াহূদী আত্মীয়-স্বজন যারা বেঁচে আছে তাদের কেউই আমাকে আশ্রয় দেবে না এবং গ্রহণও করবে না। এ আশ্রয়হীন অবস্থায় আমি কোথায় যাব? কে আমার এ অসহায় অবস্থার সহায়ক হবে? কে আমাকে স্থান দিবে? ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আর কোথাও যাবো না, আমি আপনার অন্তঃপুরে একজন দাসী হয়ে থাকতে চাই। আপনি আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন।'

রাসূলের সাথে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা : খায়বার যুদ্ধ বিজয়ের পর সফিয়্যা (রা) বন্দী হয়ে আসলে এক সময় তাকে রাসূল জিজ্ঞেস করলেন, আমার ব্যাপারে তোমার কোন আগ্রহ আছে কি? তিনি উত্তরে বললেন, শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাকার সময় আমি এ আশা পোষণ করতাম। সুতরাং ইসলাম গ্রহণের দ্বারা আল্লাহ আমাকে আপনার সাহচর্য লাভের যে সুযোগ দিয়েছেন, সে সুযোগ আমি কীভাবে হারাতে পারি? অন্য বর্ণনায় এসেছে, সফিয়্যা (রা) যখন রাসূলের নিকট আসলেন, তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা ইহুদী ছিলেন, যে আমার প্রতি শত্রুতা পোষণ করত। অবশেষে আল্লাহ তাকে নিহত করলেন। তখন সফিয়্যা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন–

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

অর্থ: 'একজনের (পাপের) বোঝা অন্যের ওপর চাপানো হবে না'।

(আন'আম ১৬৪; ইসরা ১৫; ফাতির ১৮; যুমার ৭; নাজমা ৩৮)।

তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যা পছন্দ কর, বেছে নেও। যদি তুমি ইসলামকে পছন্দ কর, তাহলে আমি তোমাকে আমার জন্য রেখে দিব। আর যদি তুমি ইহুদী ধর্ম মতকে পছন্দ কর, তাহলে আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব, যাতে তুমি তোমার কওমের সাথে মিলিত হতে পার। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল!

আমি ইসলামকে ভালবেসেছি, আপনি আমাকে দাওয়াত দেয়ার পূর্বেই আমি আপনাকে সত্য বলে স্বীকার করেছি, এমনকি আমি আপনার সওয়ারীতে চড়েছি। ইহুদী ধর্মের প্রতি আমার কোন আকর্ষণ বা অনুরাগ নেই। আর সেখানে আমার পিতা, ভাই, কেউ নেই। আপনি কুফরী বা ইসলাম যে কোনটি গ্রহণের এখতিয়ার দিয়েছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই আমার নিকট অধিক প্রিয় স্বাধীন হওয়ার চেয়ে এবং আমার কওমের নিকট ফিরে যাওয়ার চেয়ে। তখন তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য রেখে দিলেন।

সফিয়্যাকে বিবাহের কারণ : বিভিন্ন কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ–

১. আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী নিহত এবং নিজেও স্বীয় ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হওয়ায় সফিয়্যা শোক বিহ্বল ছিলেন। তার শোকাহত হৃদয়কে শান্ত করা ও তাকে দ্বীন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করেন।

২. এ বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে বনু নাযীর ও বনু কুরায়জার বিরোধিতা ও শত্রুতা হ্রাসকরণ এবং প্রশমনের অভিপ্রায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাকে বিবাহ করেন। যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়েছিল।

৩. সফিয়্যার যথাযথ সম্মান বজায় রাখা এবং এ নজীরবিহীন ইহসানের প্রতি লক্ষ্য করে ইহুদী সম্প্রদায় যাতে আল্লাহদ্রোহিতা থেকে ফিরে এসে ইসলাম কবুল করতে অনুপ্রাণিত হয়, এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সফিয়্যাকে বিবাহ করেন।

রাসূলের সাথে বিয়ে : সবদিক বিবেচনা করে রাসূল ﷺ সফিয়্যা (রা)-এর আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং খায়বার থেকে মদীনায় ফেরার পথে 'যাবাহা' নামক স্থানে তাকে বিবাহ করেন। এটা ছিল হিজরী সপ্তম সালের মহররম মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বিয়েতে অলিমা অনুষ্ঠান অর্থাৎ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার সৈয়দ আমীর আলী লিখেছেন, 'ইয়াহূদী রমণী সফিয়্যাকে খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুসলমানরা বন্দী হিসেবে এনেছিলেন। তাকেও মুহাম্মদ ﷺ উদারতার সঙ্গে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্য তাঁকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন।

এ বিয়ের ফলে আশ্রয়হীনা সফিয়্যা (রা) সুন্দর ও সর্বোত্তম আশ্রয় লাভ করেন। সাথে সাথে এ বিয়ের ফলে ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কিছুটা প্রশমন হয়। এমনকি ধীরে ধীরে ইয়াহূদীদের অনেকেই ইসলাম কবুল করেন।

সফিয়্যা (রা) সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী ছিলেন। যে কারণে মদীনায় আসলে তাঁকে দেখার জন্য মহিলাদের ভীড় পড়ে যায়। এমনকি যয়নব বিনতে জাহাশ, হাফসা, আয়েশা এবং জুয়াইরিয়া (রা) তাঁকে দেখতে আসেন। দেখা শোনার পর সকলে যখন চলে যান তখন রাসূল ﷺ আয়েশা (রা)-কে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আয়েশা, তাকে কেমন দেখলে? তিনি বললেন, সেতো ইয়াহূদী নারী। বললেন, এমন কথা বলবে না। সে তো মুসলমান হয়েছে। এখন ইসলামে সে উত্তম।'

স্বভাব-প্রকৃতি : সফিয়্যা (রা) ছিলেন ধীরস্থির মেজাজের চমৎকার একজন মহিলা। জনৈক দাসী অভিযোগ করলেন, তাঁর মধ্যে এখনও ইয়াহূদীদের গন্ধ পাওয়া যায়। কারণ সে এখনো শনিবারকে ভালবাসে। এছাড়া ইয়াহূদীদের সাথে এখনও তাঁর সম্পর্ক আছে। ওমর (রা) যখন অন্য লোকের মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করতে চান, তখন তিনি বলেন, 'শনিবারের পরিবর্তে আল্লাহ যখন শুক্রবার দিয়েছেন তখন আর শনিবারকে ভালোবাসার কোন প্রয়োজন নেই।' ইয়াহূদীদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে বলেন, 'ইয়াহূদীদের সঙ্গে তো আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক। আত্মীয়তার প্রতি আমাকে লক্ষ্য রাখতে হয়।' অতঃপর দাসীকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন– কে তোমাকে এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলল, শয়তান। এটা শুনে সফিয়্যা (রা) চুপ থাকেন এবং দাসীকে মুক্ত করে দেন।

আল্লামা ইবনে আবদুল বার সফিয়্যা (রা)-এর স্বভাব প্রকৃতি সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সফিয়্যা ছিলেন বুদ্ধিমতী, মর্যাদাশীলা এবং ধৈর্যের অধিকারিণী।'

আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেন, 'রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতি।' রাসূল ﷺ সফিয়্যাকে খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির খোঁজ-খবর রাখতেন।

সফিয়্যা-যয়নব-আয়েশার সাময়িক দ্বন্দ্ব : একবার সফরকালীন সময়ে সফিয়্যার উটটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ সময়ে যয়নব (রা)-এর সাথে একটি অতিরিক্ত উট ছিল। রাসূল ﷺ তাই যয়নবকে বললেন, যয়নব! তোমার

অতিরিক্ত উটটি সফিয়্যার সাহায্যের জন্য দাও। যয়নব বললেন, 'এ ইয়াহূদীর মেয়েকে আমি উট দিব না।' এ কথায় রাসূল ﷺ খুবই রাগ করলেন এবং একাধারে দুই মাস যয়নবের (রা)-এর সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখেন। পরবর্তীতে আয়েশা (রা)-এর মধ্যস্থতায়-এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

অন্য একদিন রাসূল ﷺ গৃহে ফিরে দেখলেন সফিয়্যা কাঁদছেন। কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, 'আয়েশা এবং যয়নব বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহর স্ত্রী এবং বংশ গৌরবের দিক থেকে এক রক্তধারার অধিকারিণী। সুতরাং আমরাই শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি কেন বললে না, আমি আল্লাহ্‌র নবী হারুনের বংশধর ও মূসার ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং রাসূল ﷺ আমার স্বামী। অতএব তোমরা কোন দিক থেকে আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হতে পারো?'

উদারতা : দয়া দক্ষিণার ক্ষেত্রেও তাঁর উদার হাত ছিল। তিনি যখন প্রথম মদীনায় আসেন ও রাসূল ﷺ-এর অন্তপুরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর সর্বাঙ্গে বহু মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার ছিল। তিনি সেসব অলঙ্কার নবী নন্দিনী ফাতিমা ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করে দেন।

ওসমান (রা) ৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হন। বিদ্রোহীরা প্রয়োজনীয় রসদপত্র এমন কি পানি সরবরাহ পর্যন্ত বন্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় সফিয়্যা (রা) ঘর থেকে বের হয়ে পড়েন এবং কিছু রসদপত্রসহ ওসমান (রা)-এর গৃহের উদ্দেশ্যে খচ্চরে চেপে বসেন। কিন্তু পথিমধ্যে বিদ্রোহীরা তাঁর খচ্চরটিকে আক্রমণ করে বসলে তিনি বলেন তোমরা আমাকে এভাবে অপমান করো না। আমি যাচ্ছি।' এরপর তিনি গৃহে ফিরে আসেন এবং হাসান (রা)-কে দিয়ে দ্রব্য সামগ্রী পৌছে দেন। পরে যে ক'দিন ওসমান (রা) অবরুদ্ধ ছিলেন হাসান (রা)-কে দিয়েই প্রয়োজনীয় সব জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিতেন।

এখান থেকে পরিষ্কার হয় সফিয়্যা (রা) কত বড় দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তিনি অসম্ভব সুন্দর রান্না করতে জানতেন। এমন কি এ ক্ষেত্রে আয়েশাও (রা) তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না।

সফিয়্যা (রা) লেখাপড়া জানা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর ইয়াহূদী আত্মীয়-স্বজনের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরে চিঠি লিখতেন। আর এ দাওয়াতী কাজের ফলে অনেকেই ইসলাম কবুল করেন।

তিনি ইসলামী জ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। এ জন্য অনেকে তাঁর কাছ থেকে মাসয়ালা-মাসায়েল জানতে চাইতেন ও জেনে নিতেন। ছহীরা বিনতে হায়দার হজ্জব্রত পালন করার পর সফিয়্যা (রা)-এর সাথে দেখা করতে এসে দেখেন যে, কুফার একদল মহিলা মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছেন আর তিনি সুন্দরভাবে সকলের জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন।

তিনি মাত্র কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যয়নুল আবেদীন ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ, মুসলিম ইবনে সাফওয়ান, কিনানা এবং ইয়াযিদ ইবনে মাআতাব প্রমুখগণ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ওফাত : ৬০ বছর বয়সে হিজরী ৫০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত করা হয়। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ তার ভাগিনাকে দেয়া হয়। বাকি সম্পত্তি গরীব মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়। জানা যায় মৃত্যুকালে তিনি নগদ এক লক্ষ দিরহাম রেখে যান।

১১. উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনা (রা)

রাসূল ﷺ ও মায়মুনার এই বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাস ও খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম কবুল করেননি। মূলত এই বিয়ের ফলেই এ দু'জন বিশাল ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেন এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আসলে এই বিয়ের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী।

নাম ও পরিচয় : পূর্বে তাঁর নাম ছিল বাররা। উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর নাম রাখা হয় মায়মূনা। তাঁর পিতার নাম হারেস এবং মাতার নাম হিন্দ বিনতে আউফ।

বংশনামা : তাঁর বংশ তালিকা হল, বাররা বিনতে হারেস ইবনে হাজন ইবনে বুযাইর ইবনে হাযাম ইবনে রোতবা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে সা'আসা'আ ইবনে মু'আবিয়া ইবনে বকর ইবনে হাওয়াযেন ইবনে মনসুর ইবনে ইকরামা ইবনে খলিফা ইবনে কায়েস ইবনে আয়লান ইবনে মুদার। আর তাঁর মায়ের দিক দিয়ে বংশ তালিকা হল, বাররা বিনতে হিন্দ বিনতে আউফ ইবনে যাহাইর ইবনে হারেস ইবনে হামাতা ইবনে জারাশ।

মায়মূনা ছিলেন কুরাইশ বংশের হাওয়াযিন গোত্রের হারেসের কন্যা; যিনি সা'আসা'আ নামক এলাকায় বসবাস করতেন। অপরদিকে তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ-এর চাচা আব্বাস (রা)-এর শালিকা এবং বিশ্বখ্যাত সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের খালা। অন্যদিকে তিনি উম্মুল ফযল লুবাবাতুস সুগরার বোন ছিলেন।

প্রথম বিবাহ : মাসউদ বিন আমর বিন উমায়ের সাকাফীর সঙ্গে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে বনিবনা না হওয়াতে মাসউদ মায়মূনাকে তালাক দেন।

দ্বিতীয় বিবাহ : পরে আবূ রহম ইবনে আবদুল্লাহর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। এ আবূ রহম সপ্তম হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মায়মুনা সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ

জীবন যাপন করতে থাকেন। এমতাবস্থায় তাঁর দুলাভাই আব্বাস (রা) উদ্যোগী হয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। ইসলামের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রাসূল ﷺ ৫১ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা মায়মুনাকে বিয়ে করতে রাজি হন।

রাসূল ﷺ-এর সাথে বিবাহ : সপ্তম হিজরী সালের জিলক্বদ মাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুসারে রাসূল ﷺ ওমরাতুল কাজা পালন করার উদ্দেশ্যে মক্কা রওয়ানা হন। এ সময় জাফর ইবনে আবূ তালিবকে মায়মুনার কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে উকিল নিযুক্ত করেন। রাসূল ﷺ ওমরার উদ্দেশ্যে যে ইহরাম বাধেন, সেই অবস্থায় এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। আব্বাস (রা) এ বিয়ে পড়ান। ওমরা পালন শেষে মদীনা ফেরার পথে 'সরফ' নামক স্থানে এ বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের মোহরানা ধার্য করা হয় ৫০০ দিরহাম। কেউ কেউ বলেন মায়মূনা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর সর্বশেষ স্ত্রী। তাদের মতে রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া দাসী ছিলেন স্ত্রী নয়। তবে ঘটনাচক্রে মনে হয় তারাও স্ত্রী ছিলেন। তারা রাসূল ﷺ স্ত্রী ছিলেন এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এখানে তাদেরকে স্ত্রী হিসেবেই গ্রহণ করা হল।

বিয়ের ফলাফল : রাসূল ﷺ ও মায়মূনার এ বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাস ও খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম কবুল করেননি। মূলত এ বিয়ের ফলেই এ দু'জন বিশাল ব্যক্তিত্ব ইসলাম কবুল করেন এবং ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেন। আসলে এ বিয়ের প্রভাব ছিল সুদূর প্রসারী। এ প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'মায়মুনাকে মুহাম্মদ ﷺ মক্কায় বিয়ে করেছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর আত্মীয় ও পঞ্চাশের উর্ধ্বে ছিল তাঁর বয়স। এ বিয়ে আত্মীয়তার অবলম্বন হিসেবেই শুধু কাজ করেনি; অধিকন্তু এ ইসলামের জন্য লাভ করেছিল দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইবনে আব্বাস এবং ওহুদের দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে কুরাইশের অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ও পরবর্তীকালে গ্রীক বিজেতা খালিদ বিন ওয়ালিদ।'

অনেকের ধারণা রাসূল ﷺ মায়মুনাকে বিয়ে না করলে খালিদ বিন ওয়ালিদ কোনোদিন হয়তো ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতেন না। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এ বিয়ে ইসলামের ও মুসলমানদের জন্য কল্যাণ বয়ে এনেছিল।

চরিত্র মাহাত্ম্য : মায়মূনা অত্যন্ত পরহেযগার একজন মহিলা ছিলেন। তিনি আল্লাহ্‌র ভয়ে সর্বদা কম্পিত থাকতেন এবং কান্নাকাটি করতেন। তিনি ছোটখাট

আদেশ নিষেধকে সমান গুরুত্ব দিতেন। একবার এক মহিলা অসুস্থ অবস্থায় মানত করল যে, 'সুস্থ হলে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়ে সালাত পড়বে। আল্লাহ তা'আলা তাকে রোগ মুক্ত করলে মানত পুরা করার উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস গমনের জন্য মায়মুনার নিকট বিদায় নিতে আসে। মায়মুনা (রা) তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, 'অন্যান্য মসজিদে সালাত আদায়ের চেয়ে মসজিদে নব্বীতে সালাত আদায়ের সওয়াব হাজার গুণ বেশি। তুমি এখানে থেকেই মসজিদে নববীতে সালাত আদায় কর।'

তাঁর সম্পর্কে আয়েশা (রা) বলেন, 'মায়মূনা ছিলেন আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয়কারিণী এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি সবচেয়ে বেশি যত্নবান মহিলা।'

একবার তাঁর এক আত্মীয় বেড়াতে আসেন। কিন্তু তার মুখ দিয়ে মদের গন্ধ আসছিল। তাই মায়মুনা (রা) ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'ভবিষ্যতে আর কখনো আমার কাছে আসবে না।'

হাদীস শিক্ষা ও সম্প্রসারণে তাঁর অবদান

মায়মূনা (রা) রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পরও দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন। মহানবী ﷺ-এর অনেক হাদীসই উম্মুল মু'মিনীনদের মাধ্যমে পরবর্তীদের কাছে সম্প্রসারিত হয়েছে। মায়মুনা (রা)-এর অবদান এ ক্ষেত্রে মোটেই নগণ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে তিনি হাদীস শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তা বর্ণনাও করেছেন। ইবনুজ জাওযী (র) বলেন : মায়মুনা (রা) থেকে ৭৬টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সহীহাইন তথা সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে ১৩টি হাদীস সংকলিত হয়েছে। ইমাম বুখারী ও মুসলিম যৌথভাবে ৭টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ১টি এবং ইমাম মুসলিম (র) এককভাবে ৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীস পুনরুক্তিসহ বুখারীতে ২১টি, মুসলিমে ১৮টি, তিরমিযীতে ৪টি, আবু দাউদে ১৫টি, নাসাঈতে ২৬টি এবং ইবনে মাজায় ১১টি সংকলিত হয়েছে। তাঁর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ, আবদুর রহমান ইবনে সায়েব, ইয়াযিদ ইবনে আছম প্রমুখ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত।

নিম্নে তাঁর থেকে বর্ণিত কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো –

١. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَكَلَ عِنْدَنَا كَتِفًا ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ

১. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ তাঁর নিকট (একদা) বকরীর কাঁধের মাংশ খেলেন, অত:পর সালাত পড়লেন, কিন্তু অযূ করলেন না।

٢. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِىْ سَمَنٍ ؟ فَقَالَ اَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوْا سَمَنَكُمْ ـ

২. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ঘি বা মাখনে ইঁদুর পতিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়ে বললেন, ইঁদুর ও তার পার্শ্ববর্তী ঘিটুকু ফেলে দিয়ে তোমরা তোমাদের ঘি খেতে পার।

٣. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْضَجِعُ مَعِىْ وَاَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ ثَوْبٌ ـ

৩. মায়ামূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঋতুস্রাব অবস্থায় আমার সাথে শয়ন করতেন। তাঁর ও আমার মাঝে কাপড়ের ব্যবধান থাকতো।

٤. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : اَدْنَيْتُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهٗ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ اَدْخَلَ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهٖ عَلٰى فَرْجِهٖ وَغَسَلَهٗ بِشِمَالِهٖ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضِ فَدَلَّهَا دَلْكًا، ثُمَّ تَوَضَّاَ وَضُوْءَهٗ لِلصَّلٰوةِ، ثُمَّ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهٖ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ مِلْأُ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهٖ، ثُمَّ تَنَحّٰى عَنْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ اَتَيْتُهٗ بِالْمِنْدِيْلِ فَرَدَّهٗ ـ

৪. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জানাবতের গোসল নিকট থেকে লক্ষ্য করেছি। তিনি প্রথমে দু'হাতের কব্জি দু'তিনবার ধৌত করেন। অত:পর হাত পাত্রে দিয়ে লজ্জাস্থানে পানি দেন এবং বাম হাত দিয়ে তা ভালভাবে পরিষ্কার করেন। অত:পর সালাতের ন্যায় অযূ করেন। এরপর তিন কোষ পানি মাথায় দিলেন, অতঃপর সমস্ত শরীর ধৌত করলেন। এরপর ঐ স্থান থেকে সরে এসে পা ধৌত করেন। অতঃপর আমি রুমাল নিয়ে আসি তবে তিনি তা গ্রহণ করেননি।

٥. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ لَوْشَاءَتْ بَهِيْمَةٌ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ ـ

৫. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন সিজ্‌দা দিতেন, কোন বকরীর বাচ্চা তাঁর দু'হাতের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে করতে পারতো।

٦. عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ (رضـ) اَنَّهَا اعْتَقَتْ وَلِيْدَةً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : لَوْاَعْطَيْتِهَا اِخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمُ لاَجْرِكِ ـ

৬. মায়মূনা বিনত আল-হারিস (রা) রাসূলের যামানায় একজন ক্রীতদাসীকে আযাদ করে মুক্ত করে দেন। অত:পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ কথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন, তুমি যদি ঐ অর্থ তোমার ভাই ইবনুল হারিসকে দিতে তবে অধিক সাওয়াব পেতে।

٧. عَنْ مَيْمُوْنَةَ (رضـ) قَالَتْ : اُهْدِىَ لِمُوْلاَةٍ لَنَا شَاةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا النَّبِىُّ ﷺ قَالَ : اَلاَ دَبَغْتُمْ اِهَابَهَا اَىْ جُلُوْدَهَا، فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ؟ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ : اِنَّمَا حَرَامٌ اُكْلُهَا ـ

৭. মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমাদের জনৈক দাসীকে একটি বকরী উপহার দেয়া হলো। বকরীটি মরে গেল। রাসূল ﷺ মরা বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, বললেন : তোমরা কি এর চামড়া পরিশোধন (দাবাগত) করে তা ব্যবহার করবে না? তাঁরা বললেন, হে রাসূল ﷺ এটা তো মৃত। নবী ﷺ বললেন, এর গোশত খাওয়া হারাম, চামড়া ব্যবহার করা নয়।

তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীস থেকে তাঁর ফিকহী সূক্ষ্মতার পরিচয় মেলে। উদাহরণস্বরূপ একটি হাদীস উল্লেখ করা হলো : একবার ইবনে আব্বাস (রা) মলিন মুখে বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বৎস! তোমার কি হয়েছে? বললেন, উম্মু আম্মার (তাঁর স্ত্রী) আমার চুলে চিরুনী করে দিত, অথচ সে আজ-কাল মাসিক স্রাবে ভুগছে। তিনি বললেন, কী চমৎকার! আমার ঐ রকম দিনে নবী ﷺ আমার কোলে মাথা মুবারক রেখে শুইতেন, কুরআন শরীফ পড়তেন, আমি ঐ অবস্থায় মসজিদে বিছানা (চাটাই) রেখে আসতাম। বৎস! হাতেও কি এসব হয় কখনও?

ওফাত : রাসূল ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণে সতত তৎপর, পরোপকারী, দানশীলা, গোলাম আযাদকারিণী মায়মুনা (রা) হিজরী ৬১ সালে 'সরফ' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। উল্লেখ্য যে, এ 'সরফে' তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এটা তাঁর জীবন ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। ওফাতের সময় তিনি আয়েশা ও উম্মু সালামা (রা)-কে ডেকে এনে বলেন, সাধারণত সতীনদের মধ্যে যা হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে আমাদের মধ্যেও সে রকম হয়ত হয়ে যেত, আমি এ ব্যাপারে লজ্জিত। আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাকে ক্ষমা করে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, তুমি আমাকে খুশী করেছ আল্লাহ তোমায় খুশী করুন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তাঁর জানাযার সালাত পড়েছিলেন এবং তিনি লাশ কবরে নামিয়েছিলেন। লাশ বহনের সময় আবদুল্লাহ বলেছিলেন, 'সাবধান! এ উম্মুল মু'মিনীনের লাশ। বেয়াদবী করো না, এমন কি তোমরা নড়াচড়াও করো না। খুব যত্ন সহকারে বহন করবে।'

১২. উম্মুল মু'মিনীন রায়হানা (রা)

তুমি আল্লাহ এবং রাসূলকে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে আমার জন্য উপযুক্ত মনে করি। 'রায়হানা বিনতে শামউন রাসূল ﷺ-এর এই প্রস্তাব আনন্দে গ্রহণ করেন।

নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম রায়হানা। পিতার নাম শামউন। তিনি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ইয়াহূদী বনু নাযীর গোত্রের মেয়ে। বংশ তালিকা হল– রায়হানা বিনতে শামউন ইবনে যায়েদ, অন্য মতে রায়হানা বিনতে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে খানাফা ইবনে শামউন ইবনে যায়েদ।

প্রথম বিবাহ : তাঁর প্রথম বিয়ে হয় বনু কুরাইজা গোত্রের হাকামের সাথে। কিছুদিন পর হাকামের মৃত্যু হয়। ৬ষ্ঠ হিজরী সালে যখন মুসলমানরা বনু নাযীর ও বনু কুরায়জা গোত্রের সব কিছু দখল করে নেয় তখন রায়হানাকে যুদ্ধ বন্দী হিসেবে নিয়ে আসা হয়। এরপর কিছুদিন তাকে কায়েসের কন্যা উম্মু মুনফিরের কাছে রাখা হয়।

বিয়ে করতে রাসূল ﷺ-এর ইচ্ছা প্রকাশ রাসূল ﷺ বিদ্রোহী ইয়াহূদী গোত্রগুলোর সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য সমগ্র আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রায়হানাকে আশ্রয় দিতে ও বিয়ে করতে মনস্থ করেন এবং তাঁকে বলেন, 'তুমি আল্লাহ এবং রাসূলকে গ্রহণ করলে আমি তোমাকে আমার জন্য উপযুক্ত মনে করি। 'রায়হানা বিনতে শামউন রাসূল ﷺ-এর এ প্রস্তাব আনন্দে গ্রহণ করেন। রায়হানা (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ছিলেন কুরায়জা গোত্রের আল-হাকাম এর স্ত্রী, মুসলমানদের সাথে কুরায়জা গোত্রের সন্ধি চুক্তি ছিল। কিন্তু আহযাব যুদ্ধে কুরায়জা গোত্রে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুশরিক কুরাইশদের পক্ষ গ্রহণ করে। ফলে আল্লাহর নির্দেশে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। দীর্ঘ দিন তাদেরকে অবরোধ করে রাখলে অনন্যোপায় হয়ে তারা আত্মসমর্পণ করে।

অত:পর তাদের পুরুষদেরকে হত্যা করা হয় এবং মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করা হয়। এ সূত্রে রায়হানা-এর স্বামী আল হাকাম নিহত হয় এবং তিনি বন্দিনী হন। প্রথমত তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং স্বীয় ইয়াহূদী ধর্মে বহাল থাকতে পছন্দ করেন। অতঃপর তাঁকে পৃথক করে উম্মুল মুনযির বিন্‌ত কায়েস-এর গৃহে রাখা হয়। কিছু দিন পর স্বত:প্রণোদিত হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

রায়হানা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর বিবাহ হওয়ার বর্ণনা নিজেই প্রদান করেয়াছেন, যা ইব্‌ন সা'দ স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন রায়হানা (রা) বলেন, বন্দীদেরকে হত্যার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট আগমন করেন, অতঃপর আমাকে কাছে বসিয়ে বললেন, তুমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ কর তা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য তোমাকে গ্রহণ করবেন। আমি বললাম, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করলাম। আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আলাদা করে দেন এবং আমার তাঁর অন্যান্য পত্নীদিগের ন্যায় একটি গৃহেই আমাদের বাসর হয়। তিনি অন্যান্য স্ত্রীর ন্যায় সমভাবে পালা বণ্টন অনুযায়ী আমার গৃহে আগমন করতেন এবং আমার ওপর পর্দার হুকুম আরোপ করেন।

অপর এক বর্ণনা মতে, প্রথমত তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি অস্বীকার করেন। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মনোক্ষুণ্ন হন। অতঃপর তিনি একদিন সাহাবীদের নিয়ে তিনি বসলেন। তখন পিছন হতে জুতার আওয়াজ শুনে তিনি বললেন, ছালাবা ইবনে শুভা রায়হানা ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর ঠিকই তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রায়হানার ইসলাম গ্রহণের সুসংবাদ দিল।

অপর বর্ণনা মতে, অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে স্বাধীন করে দেন। অতঃপর তাকে বিবাহ প্রস্তাব দেন এবং হিজাব (পর্দা) মান্য করার কথা বলে। রায়হান তাঁর উত্তরে বলেন, হে রাসূল ﷺ! বরং আমাকে দাসী হিসেবে আপনার মালিকানা রাখুন। উহাই আপনার জন্য এবং আমার জন্য সহজতর হবে। তখন রাসূল ﷺ তাকে দাসী হিসেবে রাখার ইচ্ছা পোষণ করেন। তবে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে এ মতটি জোরালো বলে মনে হয় না। কারণ সম্ভ্রান্ত ও স্বাধীন এ মহিলাকে যিনি

দৈবক্রমে বন্দী ও দাসী হয়ে গিয়েছেন, আযাদ হওয়ার স্বাধীনতা প্রদান করলে তিনি যে উক্ত কাঙ্খিত প্রস্তাব প্রত্যাখান করে বন্দীদশাকেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবেন, ইহা এক রকম অসম্ভব।

রায়হানা ছিলেন অপরূপ সুন্দরী এবং অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার ও পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারীণী। রাসূল ﷺ তার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি যা চাইতেন রাসূল ﷺ তাকে তা প্রদান করতেন। ফলে রাসূল ﷺ তাঁকে মুক্ত করে ৪০০ দিরহাম মোহরানা প্রদান করে বিয়ে করেন।

ওফাত : ইবনে সা'আদের বর্ণনা মতে হিজরী ৬ষ্ঠ সালের মুহররম মাসে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ বিয়ের ফলে ইয়াহূদী গোত্রগুলোর সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের চমৎকার উন্নতি হয়। উভয়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুসম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের দশ মাস পূর্বে রায়হানা (রা) ইন্তেকাল করেন।

১৩. উম্মুল মু'মিনীন মারিয়া কিবতিয়া (রা)

চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, অন্তর ব্যথিত, কিন্তু মুখে এমন কথা বলতে পারি না যা আল্লাহ তায়ালা অপছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত। আল্লাহর নির্দেশমত আমরা إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ *পড়ছি।*

হুদায়বিয়ার সন্ধি সংঘটিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট দূত মারফত ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করেন। এ চিঠির প্রেক্ষিতে মিসরের খ্রিস্টান শাসক মুকাওকিস সৌহার্দ্র ও শুভেচ্ছার নির্দশনস্বরূপ আপন চাচাত বোন মরিয়ম বা মারিয়া কিবতিয়াকে রাষ্ট্রীয় পর্যাপ্ত উপঢৌকনসহ তৎকালীন প্রথানুসারে মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান রাসূল-এর দরবারে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন।

অপর এক বর্ণনামতে উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত মহিলার সংখ্যা ছিল চারজন। ইবনে কাছীরের বর্ণনামতে সম্ভবত অপর দুই মহিলা এ ভগ্নীদ্বয়ের খাদিমা (দাসী)-স্বরূপ ছিলেন। এ উপঢৌকনের সাথে মাবূর নামক একজন খোজা দাস (তিনি ছিলেন মারিয়ার ভ্রাতা) এবং দূলদুল নামক সাদা রংয়ের একটি খচ্চরও প্রেরিত হয়েছিল। আরও ছিল এক হাজার মিছকালে স্বর্ণ ও (বিশটি) রেশমী কাপড়, এগুলো প্রেরণ করা হয় রাসূল ﷺ-এর দূত হাতিব ইবনে আবী বালতা'আর মাধ্যমে। হাতিব (রা) তাঁদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে মারিয়া ভগ্নীদ্বয় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মাবূর পরে মদীনায় রাসূল ﷺ-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

রাসূল ﷺ আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে লক্ষ্য রেখে এ উপহার ও উপঢৌকন গ্রহণ করেন। এ সকল উপঢৌকন পাওয়ার পর সর্বপ্রথম রাসূল ﷺ মারিয়ার

নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। মারিয়া আনন্দের সাথে এ দাওয়াত কবুল করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মারিয়ার সম্মতিতে সম্পূর্ণ ইসলামী বিধান মোতাবেক রাসূল ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। এভাবে মিসরের রাষ্ট্র প্রধান মুকাওকিসের উপহারের সঠিক মূল্যায়ন করেন।

অন্য বর্ণনা মতে, রাসূল ﷺ মারিয়াকে নিজের দাসী হিসেবে রাখেন এবং সীরীনকে হাসসান ইবনে ছাবিত (রা)-কে প্রদান করেন। তাঁর গর্ভে 'আবদু'র রাহমান ইবন হাসসান জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তম হিজরী সালের শেষের দিকে এ বিয়ে সংঘটিত হয়। এরপর রাসূল ﷺ আর কোন বিয়ে করেননি। আর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেও রাসূল ﷺ-এর জন্য নতুন কোনো বিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ্ বলেন–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ـ

অর্থ ঃ 'এরপর আর কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়। যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে আকর্ষিত করে।' (সূরা–৩৩ আহযাব : আয়াত-৫২)

অন্য বর্ণনা মতে, মারিয়া হলেন রাসূল ﷺ-এর বান্দী ও তাঁর পিতা হলেন শামঊন। সমস্ত বান্দীদের মধ্যে রাসূল ﷺ তাকেই পর্দা করার নির্দেশ প্রদান করেন।

মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে রাসূল ﷺ-এর অন্যতম পুত্র সন্তান ইব্রাহীম। আওয়ালী নামক স্থানে হিজরী ৮ম সালে তাঁর জন্ম হয়। এখানেই মারিয়া (রা) বাস করতেন। এখানে ইব্রাহীমের জন্ম হওয়ার কারণে স্থানটি 'মাশরাবাই ইব্রাহীম' নামে পরিচিতি লাভ করে। ইব্রাহীমের জন্মকালে ধাত্রী নিযুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী আবূ রাফের পত্নী বিবি সালমা। তিনি যখন রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে পুত্র সন্তান হওয়ার শুভ সংবাদটি দেন তখন রাসূল ﷺ খুশি হয়ে তাকে একজন গোলাম দান করেন।

ইব্রাহীমের জন্মের সংবাদে রাসূল ﷺ খুব খুশি হন। সাতদিনের দিন তাঁর আকীকা দেয়া হয় এবং মাথা মুড়িয়ে চুলের ওজন পরিমাণ রূপা গরীবদের মাঝে

দান করে দেন। এ দিনেই মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহীম (عليه السلام)-এর নামে তাঁর নামকরণ করা হয় ইব্রাহীম।

সদ্য প্রসূত শিশু ইব্রাহীমকে দুধ পান করানোর জন্য অনেক আনসার মহিলা প্রার্থী হন। শেষে খাওলা বিনতু যায়দুল আনসারীকে দাই নিযুক্ত করেন। এ জন্য রাসূল ﷺ তাকে কয়েকটি ফলবান খেজুর গাছ দান করেন।

খাওলা বিনতে যায়দুল উম্মু রাফে নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্বামী বারা বিন আউদু'র সাথে মদীনার উপকণ্ঠে বাস করতেন। বারা পেশায় ছিলেন কর্মকার। এ জন্য তার বাড়ি প্রায়ই ধোয়ায় আচ্ছন্ন থাকত। তবুও রাসূল ﷺ সন্তানের টানে প্রায়শ সেখানে যেতেন এবং ইব্রাহীমের খোঁজ খবর নিতেন।

সতের বা আঠার মাস বয়সের সময়ে ইব্রাহীম ধাত্রী মাতা খাওলার গৃহেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ সাহাবী আবদুর রহমানসহ সেখানে ছুটে যান। হাত বাড়িয়ে মৃত ইব্রাহীমকে কোলে তুলে নেন। আর তখনি রাসূল ﷺ-এর দু'চোখ দিয়ে বাধ ভাঙা জোয়ারের মতো পানি নেমে আসে। আবদুর রহমান আরজ করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ আপনার অবস্থা এমন কেন? রাসূল ﷺ বলেন, 'আজ আমার অপত্য স্নেহ অশ্রু বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে।'

রাসূল ﷺ তাঁর প্রিয়তম পুত্রের মৃত্যুতে ভীষণ মর্মাহত হন। তাঁর চক্ষু হতে অশ্রু প্রবাহিত হয়। এ অবস্থায় তিনি বললেন : চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত, অন্তর ব্যথিত, কিন্তু মুখে এমন কথা বলতে পারি না যা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। হে ইবরাহীম! আমরা তোমার বিচ্ছেদে শোকাভিভূত। আল্লাহর নির্দেশমত আমরা إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ পড়ছি। ফাদল ইবনে 'আব্বাস (রা) বা উম্মু বুরদা (রা) তাঁকে গোসল দেন। ছোট খাটিয়ায় করে জানাযা বহন করা হয়।

ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন ঘটনাক্রমে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সকলে বলাবলি করতে লাগল যে, রাসূল ﷺ-এর পুত্র মারা গেছে বলেই আজ সূর্যগ্রহণ হয়েছে। তারা বলতে লাগল, 'আকাশ শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে, সে জন্যই দুনিয়ায় বিদঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে।' কিন্তু বিশ্ব সংস্কারক রাসূল ﷺ যখন এ সংবাদ শুনলেন তখনই তিনি এ কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করার জন্য সকলকে ডেকে বললেন, 'সূর্যগ্রহণ এবং চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে আল্লাহ্র নিদর্শন। কারো জীবন ও মরণের

সঙ্গে এগুলোর কোনোই যোগাযোগ নেই। সুতরাং গ্রহণ লাগা বা না লাগার পেছনে কারো মৃত্যুর কোনো সম্বন্ধ নেই।'

ইব্রাহীমের লাশ ছোট একটা খাটে করে আনা হয়। রাসূল ﷺ নিজে পুত্রের জানাযা পড়ান। তারপর তাঁকে বিশিষ্ট সাহাবী উসমান বিন মাযউনের কবরের পাশে দাফন করা হয়। তাঁর লাশ কবরে নামান উসামা ও ফযল বিন আব্বাস। রাসূল ﷺ দাফন শেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। পরে কবরের ওপর সামান্য পানি ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে কবরটিকে চিহ্নিত করা হয়।

খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম ও দ্বিতীয় খলিফা আবূ বকর ও ওমর (রা) মারিয়া (রা)-কে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর উভয় খলিফাই তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি মারিয়া কিবতিয়ার মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয়-স্বজনকেও উক্ত দু'জন খলিফা সম্ভাব্য সকল সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

ওফাত : ইব্রাহীম (রা)-এর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর মারিয়া কিবতিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়।

নবী করীম ﷺ-এর বহু বিবাহের সমালোচনার প্রতিবাদ

ইয়াহুদী-খ্রিস্টানসহ ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী জ্ঞানপাপী খোদাদ্রোহীরা একাধিক স্ত্রী রাখার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর কঠোর সমালোচনা এবং তার মর্যাদার ওপর কটাক্ষ করতে দেখা যায়। তারা বিশ্বনবী ও বিশ্বসংস্কারক পূত পবিত্র চরিত্রের অধিকারী রাসূল ﷺ-এর পবিত্র চরিত্রের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন। রাসূল ﷺ তাঁর পবিত্র যৌবনের সিংহভাগ সময় ব্যয় করেন তার থেকে ১৫ বছর বড় একজন বিধবা নারীকে স্ত্রী বানিয়ে। প্রথম স্ত্রী খাদিজা (রা)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর বয়স যখন ৫১/৫২ বছর তখন তাঁর মাঝে নারীভোগের চেতনা আসল তা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহের বীজ রোপণ করা এবং ইসলামের প্রবর্তক বিশ্বনবীর প্রতি অমুসলিমদের অন্তরে ঘৃণা আর অসমর্থনের মনোভাব সৃষ্টি করাই হচ্ছে মূলত: এদের অহেতুক অপপ্রচারের আসল ও ব্যর্থ উদ্দেশ্য। কোন কোন মুসলিম যুবকের ইয়াহুদী প্ররোচনার জবাবে অপারগতা এবং দুর্বলতা প্রকাশ হয় বিধায় এ সম্পর্কে কিছু লেখার প্রয়োজন মনে হচ্ছে। অন্যথায় এরূপ সমালোচনাকারীদের সমালোচনার প্রতিবাদে কলম ধরার কোন প্রয়োজন ছিল না। অসত্যের মুকাবিলায় সত্যের সম্মুখে নতশির হওয়ার লোক এরা নয়। সঠিক তথ্য অবগত হওয়ার পরও ওরা বিভ্রান্তি বর্জন করে না। ওদের এরূপ ভূমিকার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ.

অর্থ: জ্ঞাত বস্তু তাদের নিকট আসলে তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, কাফেরদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ। (সূরা–২ আল বাক্বারা : আয়াত-৮৯)

فَاِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ (اَىْ يَعْلَمُوْنَ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ) وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ.

অর্থ: তারা আপনাকে মিথ্যুক বলে না, (অর্থাৎ, আপনি রাসূল তা তারা জানে) কিন্তু জালেমরা আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করে থাকে।

(সূরা–৬ আন'আম : আয়াত-৩৩)

তাই এদের ভিত্তিহীন সমালোচনার মুখোশ উন্মোচন এবং সঠিক তত্ত্ব প্রকাশের তাগিদে আমরা বলতে চাই যে, অধিক বিবাহ রাসূল ﷺ-এর চরিত্র মাধুরী, তাঁর দয়া-মায়া, উদারতা, ধৈর্য-সহ্য, শিষ্টাচারিতা, মহত্ত্ব এবং নবুওয়্যাতের উৎকর্ষতার পরিচায়ক। কেননা–

১. যৌবনের ২৫তম বয়সে টগবগে যুবক বিশ্বনবী সমাজের নিকট নির্মল ও পূত-পবিত্র চরিত্রের প্রতীক হিসেবে পরিগণিত ছিলেন। যৌবনের তাড়নায় উদভ্রান্ত হয়েছেন, অপকর্মে সাড়া দিয়েছেন, এমনকি কোন মহিলার প্রতি এরূপ মন-মানসিকতা নিয়ে ভ্রুক্ষেপ করেছেন, তার ঘোর শত্রুরাও তাঁর প্রতি এমন দোষারোপ করতে সাহস করেনি। ৪০ বছর বয়সের মহিলা খাদীজাকে বিবাহ করেন, তাও নিজের খাহেশে নয়, বরং খাদীজার প্রস্তাবে। তখন তার বয়স ছিল ২৫ বছর। যৌবনের পুরো সময়, গোটা যৌবনকাল এরূপ এক বয়স্কা মহিলাকে নিয়েই কাটিয়ে দেন, আর কোন বিবাহ করেননি। তাঁর ৫০ বছর বয়সের সময় ৬৫ বছর বয়স্কা স্ত্রী খাদীজার মৃত্যু হয়। যদি তিনি নারী ভোগের কামনায় উদ্বেলিত স্বভাবের হতেন, তাহলে এ দীর্ঘসময় আরো দু-চারটি বিবাহ করে নিতেন। কারণ আরবের সেরা সুন্দরীরা তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী ছিলেন। কারণ এটাই ছিল যৌবনের আসল মুহূর্ত, এ মুহূর্তেই নারীভোগের প্রতি মানুষের আকর্ষণ অধিক হয়ে থাকে।

খাদীজা (রা)-এর আগেও আরো দুটি বিবাহ হয়েছিল। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও মানবিক কারণেই তাকে বিবাহ করেন। ২৫ বছর বয়সে

একজন বয়স্কা মহিলাকে বিবাহ করে যৌবনের পুরো সময় তাকে নিয়ে কাটিয়ে দেয়া সমালোচনাকারীদের অসারতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয় কি? যাদের অন্তর ব্যাধিমুক্ত, যারা ন্যায় ও নিরপেক্ষ বিচারক, যারা শুভবুদ্ধির অধিকারী, তাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর অবশ্যই তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন। কিন্তু কেন করেছেন, কোন প্রয়োজনে করেছেন, এ ব্যাপারে সমালোচনাকারীদের চক্ষু অন্ধ হলেও বুদ্ধিজীবী এবং সঠিক পর্যালোচনাকারীদের চক্ষু অন্ধ নয়।

২. খাদীজা (রা)-এর মৃত্যুর পর বিশ্বনবী ﷺ সাওদা (রা)-এর মতো একজন বিধবা মহিলাকে বিবাহ করেন। ইসলামের প্রথম আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার জালেম কাফেরদের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামী সুকরান মৃত্যুবরণ করলে বৃদ্ধা এ মহিলার জীবনে নেমে আসে চরম নৈরাশ্য ও হতাশা। মোটা স্বাস্থ্যের অধিকারিণী ও অনুভূতিহীনা এই বিধবাকে কে বিবাহ করবে? তাকে কে আশ্রয় দেবে! কারও তার প্রতি আকর্ষণ নেই। হাবশায় হিজরতকারিণী দুঃখিনী বিধবা বৃদ্ধা মহিলাকে বিবাহ করে তার প্রতি করুণা এবং সহনশীলতা প্রদর্শন করা বিশ্বনবীর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। কারণ এমন কোন মানবের পক্ষে সম্ভব নয় যে, নিজের বয়সের চেয়ে ৪ বছর বড় বা সমান এবং মোটা নারীকে বিবাহ করে জীবন কাটানো।

৩. এরপর তিনি আয়েশা (রা)-কে বিবাহ করেন। স্ত্রীদের মধ্যে কেবল আয়েশাই ছিলেন কুমারী। আল্লাহর ইশারাতেই এ বিবাহ কাজ সম্পাদিত হয়। তখন আয়েশা (রা)-এর বয়স ছিল ৬/৭ বছর আর রাসূল ﷺ-এর বয়স ছিল ৫২ বছর। আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মতো একজন নিঃস্বার্থ কর্মীর মন জয় করাও একটি অন্যতম কারণ। তার সাথে বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করার তাগিদেও এ বিবাহ ছিল একটি উপযুক্ত উপায় এবং পদক্ষেপ। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ছিলেন প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী একজন নির্ভিক মুসলিম। সততা, সরলতা ও শিষ্টাচারিতার কারণে আরব সমাজে একজন নির্ভরযোগ্য ও বিশেষ ব্যক্তিত্ব হিসেবে তাকে মূল্যায়ন করা হতো। তিনি হলেন ইসলাম এবং ইসলামের

মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর জানমাল কুরবানকারী প্রধান ব্যক্তিত্ব। তার কন্যা ব্যতীত কে বিশ্বনবীর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদার অধিকারিণী হতে পারে? সে ব্যতীত কে হতে পারে উম্মুল মু'মিনীনের শিরোপার অধিকারিণী? এ বিবাহের ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট সম্পর্ক এবং আনুগত্যের ফলে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইসলাম প্রচার প্রসারের ভূমিকা তাকে মুসলিম উম্মার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং নবীর প্রধান খলীফার মর্যাদায় সমাসীন করেছে।

৪. এরপর ওমর (রা)-এর কন্যা হাফসাকে তিনি বিবাহ করেন। তার প্রথম স্বামী খুনাইস ইবনে হুযাফা ওহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করার পর রাসূল ﷺ বিবাহ করেন। বিধবা হাফসার চিন্তাগ্রস্ত পিতা ওমর (রা) স্বীয় কন্যার আশ্রয় খুঁজে আবূ বকর এবং উসমানের নিকট বিবাহ প্রস্তাব করেন। সেখান থেকে ব্যর্থ হওয়ার পর অধিরচিত্তে রাসূল ﷺ-এর মহান দরবারের শরণাপন্ন হন। এমনকি আবূ বকর এবং উসমানের মতো প্রাণপ্রিয় বন্ধুদের অসম্মতি প্রকাশের অসহনীয় বেদনার কথাও বিশ্বনবীর গোচরীভূত করেন। এ মুহূর্তে রাসূল ﷺ ওমর (রা)-কে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করেন : হাফসাকে তাদের তুলনায় উত্তম ব্যক্তি বিবাহ করবে। ওমর (রা)-কে সান্ত্বনা প্রদান, মুসলিম উম্মার শ্রেষ্ঠতম দুজন মহামানবের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি এবং হিজরতকারিণী বিধবা হাফসার প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শনের তাগিদে এ বিবাহ যে কত গুরুত্বপূর্ণ এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ ছিল তা বলাই বাহুল্য।

৫. এরপর রাসূল ﷺ যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা)-কে বিবাহ করেন। তার প্রথম স্বামী উবায়দা ইবনে হারিছ বদরের যুদ্ধ সূচনাকারী তিন জনের একজন ছিলেন। বদরের যুদ্ধে আহত হয়ে উবায়দার শাহাদাত বরণ করার পর আশ্রয় হিসেবে রাসূল ﷺ যয়নবকে বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের ৮ মাস পর রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬. এরপর রাসূল ﷺ উম্মু সালামা (রা)-কে বিবাহ করেন। উম্মু সালামা (রা)-এর প্রথম স্বামী আবূ সালামা রাসূল ﷺ-এর দুধ ভাই ছিলেন। স্ত্রীকে নিয়ে হাবশা এবং মদীনায় হিজরত করেন। আবূ সালামা বদর এবং ওহুদ উভয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং ওহুদের যুদ্ধে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ

করেন। দু' দুটি হিজরত অতঃপর স্বামীর শাহাদাত বরণের কারণে উম্মু সালামা (রা) অসহায় এবং দুঃখ-কষ্টের চরম সীমায় উপনীত হন। রাসূল ﷺ-এর চাচাতো এবং দুধ ভাই আবূ সালামার এতীম সন্তানাদির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে দুধ শরীক ভাইয়ের হক আদায় করা রাসূল ﷺ-এর জন্য একান্ত কর্তব্য ছিল।

উম্মু সালামা (রা) ছিলেন উঁচু খান্দান এবং সম্মানী বংশের মহিলা। ইসলাম এবং মুসলমানের জন্য ছিল তার অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানী। স্বামীর মৃত্যুর কারণে এতীম সন্তানাদির লালন-পালন কষ্টে একাকী জীবন যাপন দুরূহ হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় এই বিবাহ তার প্রতি বিশ্বনবীর সহানুভূতি বৈ অন্য কিছু নয়।

৭. এরপর নবী করীম ﷺ আপন ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহাশ (রা)-কে বিবাহ করেন। তার প্রথম বিবাহ হয় রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় গোলাম পালকপুত্র যায়েদ ইবনে হারেছার সাথে। এ বিবাহের মূল কারণ ছিল জাহেলী যুগের গলদ প্রথার মূলোৎপাটন করা। কেননা সে যুগে পালকপুত্রকে আপন পুত্র মনে করা হতো এবং পালকপুত্রের স্ত্রীকে পালক পিতার জন্য বিবাহ করা হারাম মনে করা হত। এ কুপ্রথার মূলোৎপাটনের জন্যই এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

৮. এরপর রাসূল ﷺ বনু মুসতালিকের মহিলা জুওয়াইরিয়াকে আযাদ করে তাকে বিবাহ করেন। পিতা গোত্র প্রধানের প্রস্তাবে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদেই এ বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়। ফলে সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ বিনা শর্তে এবং বিনিময় গ্রহণ করা ব্যতীত বনু মুসতালিকের সমস্ত বন্দীকে মুক্ত করে দেন। আর তারা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। বস্তুত: এ বিবাহ ছিল বনু মুসতালিকের জন্য বিরাট রহমত এবং বরকতস্বরূপ এবং সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য একটি শিক্ষণীয় আদর্শ।

৯. এরপর রাসূল (স) আবূ সুফিয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবাকে বিবাহ করেন। তার প্রথম বিবাহ হয় উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে। উম্মু হাবীবা (তার প্রথম স্বামীর সাথে হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ সেখানে মুরতাদ

হয়ে মৃত্যুবরণ করে। হাবশা থেকে আসার পর দুঃখিনী বিধবা মহিলার প্রতি সমবেদনা এবং সম্মানস্বরূপ মক্কার কাফেরদের অবিস্মরণীয় নেতা আবূ সুফিয়ানের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একান্ত প্রয়োজনে এ বিবাহ ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রকারান্তরে এ বিবাহের কারণে রাসূল ﷺ-এর প্রতি তার শত্রুতার চেতনা শিথিল হয়ে পড়ে, আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তার অভিযান একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়।

বরং তার অন্তরে লুক্কায়িত অনুভূতির ফল মক্কা বিজয়ের সুপ্রভাতে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের সূরতে প্রকাশ পায়। তার ইসলাম গ্রহণ মক্কার হাজার হাজার কাফেরদের জন্য ইসলাম গ্রহণের পথ সুগম করে। তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের বীর মুজাহিদ ও একনিষ্ঠ নেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্নমুখী অভিযান ও রণকৌশলে এবং বুদ্ধি পরামর্শের জন্য যেমন ছিলেন তিনি বিশ্বনবীর লক্ষ্যের পাত্র, তেমনি ছিলেন সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের জন্য বিশেষ কেন্দ্রবিন্দু। তিনি এবং তার আনুগত্যকারী সকলেই ইয়ারমুক ও শামসহ বিভিন্ন যুদ্ধ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

১০. এরপর ইয়াহুদীদের ঐতিহাসিক নেতা হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা খায়বারের যুদ্ধে বন্দীকৃত সফিয়্যা ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলে রাসূল ﷺ তাকে আযাদ করে বিবাহ করেন। ইয়াহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব এবং ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, তাদেরকে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্টকরণের জন্য এ বিবাহ ছিল অত্যন্ত উপকারী। এরা একজন নবীয়ে উম্মীর শুভাগমনের কথা তাওরাত এবং ইঞ্জীলের সূত্রে অবহিত ছিল। অবহিত ছিল বলেই তারা গোপনে বিশ্বনবীর বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ছিল কিন্তু পরশ্রীকাতরতা এবং শত্রুতা ছিল তাদের জন্য বাধা। এমতাবস্থায় সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ ইয়াহুদীদের শত্রুতার অগ্নি নির্বাপিতকরণ এবং ইসলামের প্রতি তাদের সমর্থন ও আনুগত্য আদায়ের কামনা বাসনার নিরিখে এ বিবাহ ছিল অত্যন্ত ফলদায়ক উপায় ও কৌশল।

১১. এরপর রাসূল ﷺ মাইমূনা বিনতে হারিছকে বিবাহ করেন। তিনি হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, খালেদ ইবনে ওয়ালীদ, এবং জাফর তাইয়্যারের সন্তানাদির খালা। ২৬ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। হিজরী ৭ সনে কাজা উমরা আদায় করে ফেরার পথে তান্‌য়ীম নামক স্থানের নিকটবর্তী এলাকা 'ছারিফ' নামক স্থানে রাসূল ﷺ-এর সাথে তার বিবাহ হয়। একজন সম্মানী দুঃখিনী বিধবা মহিলাকে আশ্রয় দেয়া এবং উম্মতের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করাই ছিল বিশ্ব নবীর এ বিবাহের মূল উদ্দেশ্য। এটা ছিল রাসূল ﷺ-এর সর্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ।

তারপর রাসূল ﷺ-এর নিকট রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া (রা) হাদিয়া স্বরূপ আসলে তাদেরকে প্রথমে দাস হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নিলে তাদের পছন্দ মোতাবেক ও আল্লাহর নির্দেশে তাদেরকে উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশ্য কারো কারো মতে রায়হানা ও মারিয়া কিবতিয়া (রা) রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তারা ছিলেন রাসূল ﷺ-এর দাসী। রাসূল ﷺ মূলত কয়েকটি কারণে একাধিক বিবাহ করেছেন–

১. আসলে ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শহীদ হওয়ার ফলে ইসলামের সেই প্রথম যুগেই বিধবাদের একটি লম্বা কাফেলা দাঁড়িয়ে যায়। যাঁরা ছিলেন একান্তই অসহায়। কারণ মুসলমান হওয়ার কারণে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা তাঁদেরকে একটু আশ্রয় পর্যন্তও দিতে রাজি ছিল না। এমতাবস্থায় রাসূল (স) এ অসহায় মুসলমান বিধবা মহিলাদেরকে বিয়ে করার জন্য সাহাবীদেরকে উৎসাহ দিতে থাকেন। নিজেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক বাড়ানোর জন্য।

৩. পারিবারিক একান্ত বিষয়গুলোকে উম্মতকে জানানোর জন্য।

৪. পোষ্যপুত্রের স্ত্রী বিয়ে করা যায় এ বিধান চালু করার জন্য।

৫. মুখঢাকা ভাইয়ের মেয়েও বিবাহ করা যায় তা বাস্তবায়ন করণার্থে।

৬. একান্তই ইসলামের স্বার্থে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে।

৭. সর্বোপরি আল্লাহর নির্দেশে সকল বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে, চারের অধিক বিবাহ করা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার পূর্বেই রাসূল ﷺ-এর এ সব বিবাহ হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আয়াতে অতিরিক্ত স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে বলা হয়নি। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِىُّ اِنَّآ اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ الّٰتِىْٓ اٰتَيْتَ اُجُوْرَهُنَّ وَمَا
مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ مِمَّآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ
عَمّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِىْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز
وَامْرَاَةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَّهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِىِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِىُّ اَنْ
يَّسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط قَدْ عَلِمْنَا مَا
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىْٓ اَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

অর্থ: হে নবী! যাদের মোহরানা আদায় করেছেন আপনার জন্য সে স্ত্রীদেরকে হালাল করেছি এবং আপনার করায়ত্ব দাসীদের আপনার জন্য হালাল করেছি। আর আপনার চাচাতো, ফুফাতো, মামাতো এবং খালাতো বোন যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে তাদেরকে বিবাহের জন্য হালাল করেছি এবং কোন মু'মিন নারী নিজেকে নবীর নিকট সমর্পণ করলে নবী তাকে বিবাহ করতে ইচ্ছা পোষণ করলে তাও হালাল। এটা কেবল আপনার জন্য; অন্য কোন মুমিনের জন্য হালাল নয়। যাতে আপনার কোন অসুবিধা না হয়। মু'মিনদের স্ত্রী এবং দাসীদের ব্যাপারে আমি যা নির্ধারণ করেছি তা আমার জানা আছে। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা আহযাব : আয়াত-৫০)

চারের অধিক বিবাহের এ বিষয়টি বিশ্বনবী এবং তার স্ত্রীদের জন্য একান্ত ব্যতিক্রমধর্মী একটি বিষয়। তাছাড়া রাসূল ﷺ শারীরিকভাবে ৪০ জন পুরুষের

শক্তি রাখতেন। এরূপ ব্যতিক্রম আরো অনেক ব্যাপারে রয়েছে। যেমন : তার প্রতি বাধ্যতামূলক কিয়ামুল্লাইল, বিরতিহীন রোযা এবং তাঁর পরিবারের পক্ষে যাকাত ফিতরা গ্রহণ করা হারাম হওয়া, তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকা, নবীর স্ত্রীদের প্রতি গোনাহের শাস্তি অধিক নির্ধারণ করা, অধিক নেক আমল করার বাধ্যতামূলক নির্দেশ ইত্যাদি। এ সবকিছুই বিশ্বনবী এবং তাঁর পত্নীদের জন্য একান্ত এবং ব্যতিক্রমী নির্দেশ। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا ـ وَمَنْ يَّقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيْمًا ـ

অর্থ: হে নবী পত্নীগণ! তোমাদের কেউ অশ্লীল কাজ করলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হবে। যা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আর যে আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের অনুগত হবে আর নেক কাজ করবে আমি তাকে দুবার পুরস্কার দিব এবং আমি তার জন্য সম্মানজনক রিযিক প্রস্তুত রেখেছি। (সূরা আহযাব : আয়াত-৩০-৩১)

এরপর অধিক বিবাহ থেকে রাসূল ﷺ-কে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন–

لَايَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَاۤ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ـ

অর্থ: এরপর কোন নারী আপনার জন্য হালাল নয় এবং তাদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাও হালাল নয়, তাদের রূপলাবণ্য আপনাকে মুগ্ধ করলেও।

(সূরা আহযাব : আয়াত-৫২)

চারের অধিক স্ত্রীদেরকে তালাক দেয়ার নির্দেশ না দেয়ার পিছনে তাদের প্রতি ইহসান, দয়া-মায়া, মানবতা প্রদর্শন ইত্যাদি হেকমত বিদ্যমান রয়েছে। যদি তাদের কতককে তালাক দেয়া হতো, তাহলে তারা বিরাট বিপদের সম্মুখীন হতো, তাদের কোন আশ্রয় থাকত না। কেননা বৃদ্ধা রূপহীনা বিধবাদেরকে বিবাহ করতে কেউ সম্মত হত না। অপরপক্ষে এ বিবাহসমুহের বর্ণিত উদ্দেশাবলী সম্পূর্ণ ভাবেই বিনষ্ট হত। তাদেরকে সম্মান প্রদর্শনের পর অসম্মান প্রদর্শন করা হতো, খাতামুন্নাবী এবং শ্রেষ্ঠ নবীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের পর তাদেরকে অপদস্ত করা হতো। যদি রাসূল ﷺ তাদেরকে তালাক দিতেন, তাহলে তা হতো তাঁর শিষ্টাচারিতা এবং উত্তম চরিত্রের জন্য বিরাট কুলঙ্ক। তিনি সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি রহমতস্বরূপ আল্লাহর এই ঘোষণার অবমাননা সাব্যস্ত হতো। বস্তুত: তাদেরকে তালাক দেয়া শ্রেষ্ঠ নবী এবং বিশ্বনবীর জন্য মোটেই শোভনীয় হতো না।

তাছাড়া আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-এর স্ত্রীদেরকে মুসলমানদের জননী ঘোষণা করেছেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে উম্মতের পক্ষে নবী পত্নীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। ইরশাদ হয়েছে–

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهَاتُهُمْ ـ

অর্থ: নবী মু'মিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ আর তার স্ত্রীগণ তাদের মাতা। (সূরা আহযাব : আয়াত-৬)

এ সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে নবীর স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা উম্মতের জন্য হারাম করা হয়েছে। নবীপত্নীদেরকে বিবাহ করা নবীর প্রতি অবমাননা এবং নবীর সাথে অসদাচরণ হিসেবে এটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য। আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ـ

অর্থ: আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া এবং তার ওফাতের পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য হালাল নয়। এটা আল্লাহর নিকট বড় অপরাধ।

(সূরা আহযাব : আয়াত-৫৩)

ইসলামের শত্রু এবং পরশ্রীকাতর লোকদেরকে রাসূল ﷺ-এর সমালোচনা করে এ কথাও বলতে শোনা যায় যে, তিনি ৫৩ বছর বয়সে অল্প বয়সের কুমারী কন্যা আয়েশাকে বিবাহ করলেন কি করে? কিন্তু এদের এরূপ সমালোচনা আমাদের দৃষ্টিতে মাকড়সার জালের মতো। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ، وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ.

অর্থ: তারা মাকড়সাতুল্য, যে ঘর বানায় আর সমস্ত ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো অধিক দুর্বল। (সূরা আনকাবুত : আয়াত-৪১)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, অনেক মুসলমানকেও এ ব্যাপারে সন্দিহান এবং দুর্বলমনা প্রতীয়মান হয়। তারা এ ব্যাপারে প্রশ্নের সম্মুখীন হলে অথবা কেউ এ ব্যাপারে তাদেরকে কু-ধারণা দিলে তারা হতভম্ব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। চোখে মুখে কোন দিশা পায় না, আবার অনেকে তো তাদের সাথে হ্যাঁ মিলিয়ে জাহান্নামের পথে ধাবিত হয়ে যায়। এর জবাবে আমরা বলতে চাই যে, হে মুসলিম সমাজ! এ বিষয়টিকে শত্রুদের দৃষ্টিতে বিবেচনা করা সমীচীন নয়। সাদাকে কালো, সুন্দরকে অসুন্দর, হালালকে হারাম এবং সম্ভবকে অসম্ভবের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা সঠিক হবে না।

মিথ্যা অপপ্রচারক, সত্য গোপনকারী, সত্যের সাথে অসত্য মিশ্রণকারী, গোমরাহ, পাপাচারী, অশ্লীল এবং ফ্লিমবাজদের গালগল্প, তাদের রচিত বইপুস্তক, প্রবন্ধ এবং নাটকের চশমায় রাসূল ﷺ-এর বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা ন্যায়সংগত হবে না। বরং ইসলাম, ঈমান এবং ব্যাধিমুক্ত অন্তরে এ ব্যাপারটি বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দুশমন কাফের মুনাফিক, ফাসেক, ফাজের কিয়ামতের হিসাব নিকাশে অবিশ্বাসীদের হাতিয়ার হওয়া মুসলমানদের জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয়। কারণ এ বিবাহ রাসূল ﷺ আবু বকর সিদ্দীক (রা), আয়েশা (রা) এবং মুসলিম জাতির জন্য অতীব বরকতময় এবং চিরন্তন আদর্শ।

স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রা)-এর স্থান সবার উপরে। তাকে রাসূল ﷺ কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন। তার প্রতি ছিল রাসূল ﷺ-এর অফুরন্ত ভালোবাসা, দয়া মমতা এবং একান্ত প্রেম। সুতরাং যে রাসূলের আনন্দে আনন্দ, তাঁর খুশীতে খুশী এবং তাঁর শান্তিতে প্রশান্তি বোধ করে না সে আবার কেমন মুসলমান? এতো ঈমানের দুর্বলতা, অন্তরের কলুষতা এবং মহব্বতের দাবির অসারতার বাস্তব প্রমাণ। রাসূলের জন্য এবং তার উম্মতের জন্য আল্লাহ্ যা হালাল করেছেন তা হারাম করার অধিকার কার আছে? শ্রেষ্ঠ নবীর সাথে শ্রেষ্ঠতমা মহিলা আয়েশা (রা)-এর বিবাহ মহান রাব্বুল আলামীনের তত্ত্বাবধানে তাঁর নির্দেশক্রমেই হয়েছে, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে?

বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নির্দেশক্রমে স্বয়ং জিবরাঈল (عليه السلام) রেশমের সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় আয়েশা (রা)-কে রাসূল ﷺ-এর সম্মুখে হাজির করত: বলেছিলেন যে, এ মহিলা ইহকাল এবং পরকাল উভয় জগতের জন্য আপনার স্ত্রী।

এ বিবাহের ব্যবস্থাপনায় আছেন একজন ফেরেশতা, অহীপ্রাপ্ত নবী এবং নবীর পরম বন্ধু, ছাওর পাহাড়ের সাথী, পবিত্র কুরআনের ভাষায় শ্রেষ্ঠতম মানব আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম। আর আয়েশা (রা) হচ্ছেন উম্মুল মু'মিনীন, সমকালীন মহিলাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহিলা। যাদের নিকট পিতৃতুল্য বয়সের স্বামীর সাথে অপ্রাপ্ত বয়স্কার বিবাহ অযৌক্তিক এবং আশোভনীয় মনে হয়, তাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত যে, তাদের এ চিন্তা ও উক্তি মহান আল্লাহকে দোষারোপ করার শামিল কি না? তাদের একথাও বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয় যে, এখানে কোন রহস্য এবং স্বতন্ত্র কোন কিছু থাকতে পারে।

রাসূল ﷺ আয়েশার সাথে এমন শিষ্টাচারিতার সাথে ব্যবহার করতেন যে, আয়েশা বয়সে ছোট একথা তিনি কখনও বুঝতে পারতেন না। আর বয়সের কারণে ব্যবহারের তারতম্য না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ তিনি আল্লাহর প্রিয় এবং দয়ালু নবী ছিলেন। পবিত্রতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠার প্রতীক। তিনি নবী

হিসেবে যেমন ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি স্বামী হিসেবে এবং পরিবারের জন্যও শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম ব্যক্তি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। প্রকারান্তরে এ বিবাহ তার রিসালাত এবং নবুওয়্যাতের জন্য ছিল উজ্জ্বল প্রমাণ।

রাসূল-এর সাথে জীবন-যাপনকালে আয়েশা (রা) কখনও ভাবতেও পারেননি যে, তিনি বস্তুজগতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আয়েশা (রা) যেমন ছিলেন কুমারী এবং সুন্দরী, তেমনি আল্লাহ্ তাঁর নবীকে অতি সুন্দর এবং যৌবন শক্তিতে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। যৌবন শক্তি, যৌন প্রক্রিয়া এবং জীবন পরিক্রমায় তার কোন নজীর যুবকদের মধ্যেও ছিল না। তদুপরি তার প্রতি সদা সর্বদা অহী নাযিল হতো। নবী হিসেবে রাসূল শারীরিক শক্তির প্রশ্নে বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন। অনেক সাহাবার মতে রাসূল ৪০ জন শক্তিশালী পুরুষের সমান শক্তির একাই অধিকারী ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে একই রাত্রে সমস্ত স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে এবং তাদের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারতেন, যা কোন সাধারণ লোকের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। রূপ সৌন্দর্যের প্রশ্নে রাসূল-এর কোন নজীর ছিল না। এমন কি ইউসুফ () -এর তুলনায়ও তিনি অধিক রূপ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। কোন কোন সময় তা প্রকাশও পেয়ে যেত। সাহাবী বারা (রা) বলেন, রাসূল মধ্যম আকারের লোক ছিলেন। একদিন (পাড়ে কাজ করা) লাল রংয়ের পোষাক পরিহিত অবস্থায় রাসূল-কে দেখেছি। এমন রূপের লোক আর আমি কোনদিন দেখিনি এবং শুনিওনি।

এ বিবাহের কারণে আয়েশা (রা) যে পদমর্যাদার অধিকারী হন কোন বিবেক বুদ্ধির অধিকারী মহিলা তার আকাঙ্ক্ষী না হয়ে পারে না। এ বিবাহের কারণেই তিনি শ্রেষ্ঠ নবীর প্রিয়তমা স্ত্রী এবং উম্মুল মু'মিনীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। জান্নাতের উচ্চমর্যাদার সুসংবাদ দুনিয়ার বুকেই লাভ করেন। পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রশংসার বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। সূরায়ে নূরের প্রায় এগারোটি আয়াতে তাঁর চারিত্রিক পবিত্রতা এবং উৎকর্ষতার কথা স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করেছেন। এ গভীর তত্ত্ব এবং রহস্যময় প্রত্যেকটি আয়াতই মুসলিম উম্মাহ এবং সমগ্র মানব

জাতির জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। পূত:পবিত্র এ সমাজ গড়ে তোলার জন্য এর প্রত্যেকটি আয়াতই সীমাহীন গুরুত্ব রাখে। তার পবিত্রতা এবং আদর্শ স্ত্রী হওয়ার কথা স্বয়ং আল্লাহ ঘোষণা করে ইরশাদ করেন–

اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ اُولٰٓـئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ -

অর্থ: সচ্চরিত্রা নারীগণ সচ্চরিত্র পুরুষের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষগণ সচ্চরিত্রা নারীদের জন্য। লোকেরা যা বলে তারা তা হতে সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা নূর : আয়াত-২৬)

হে আয়েশা! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার পবিত্রতার বর্ণনা আপনার জন্য মুবারক হোক। আপনি যে কত মহান এবং কত মহান আপনার পদমর্যাদা! আয়েশার প্রতি অপবাদের বর্ণনা সম্বলিত আয়াত যতবার মানুষ তেলাওয়াত করবে, পাঠ করবে এবং গবেষণা করবে, তাদের অন্তরে আয়েশা (রা)-এর পবিত্রতা এবং চরিত্রগত নির্মলতা প্রস্ফুটিত হবে এবং হতে থাকবে।

আয়েশা (রা) বিশ্বনবীর জীবদ্দশাতেই বিশিষ্ট ফকীহা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েল তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। ফলে সমকালীন এবং পরবর্তী যুগে নারী সমাজের অগণিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তিনি নবীর সরাসরি প্রতিনিধিত্ব করেন।

সারা বিশ্বের লোকেরা বিশেষত: মহিলারা রাসূল ﷺ-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাতের পর মদীনায় সমবেত হতেন। আর তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের হুকুম-আহকাম এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের তরবিয়াত করতেন। তার নির্দেশিত মাসআলা-মাসায়েল এবং বর্ণিত হাদীসমূহ ফিকাহের কিতাবসমূহে অদ্যাবধি সুসংরক্ষিত রয়েছে এবং মুসলিম উম্মাহ তার দ্বারা সীমাহীন উপকৃত হয়ে চলেছেন। তার জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরামও তার প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন।

রাসূল ﷺ-এর গভীর এবং রহস্যময় তত্ত্ব, তাঁর ইবাদত, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, উমরা, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বস্তু বিরাগিতা, দ্বীনতা-হীনতা,

মুনাজাত-কান্নাকাটি, যুদ্ধ-সন্ধি, ভিতর-বাহির মোটকথা রাসূল ﷺ-এর আদর্শ জীবনের বিস্তারিত বিষয়াদি উম্মতের নিকট পৌছানো তিনি একনিষ্ঠ মাধ্যম এবং সূত্র। যাদের আয়েশা (রা)-এর জীবনী সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞান আছে তারা নিঃসন্দেহে একথা বলতে বাধ্য যে, বিশ্বনবীর আদর্শ জীবনকে সুসংরক্ষিত করে সঠিক সুন্দরভাবে উম্মতের নিকট পৌছানোর জন্য আল্লাহ আয়েশা (রা)-কে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন এবং তিনি তার দায়িত্ব যথাযথভাবেই আদায় করেছেন।

আয়েশা (রা)-এর বিবাহ আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জীবনেও বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। এ বিবাহের বরকতে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঈমানী শক্তি, রাসূল ﷺ-এর সাথে বন্ধুত্ব বন্ধন, সিদ্দীকী মকাম, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সুদৃঢ় হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বনবী ﷺ সাহাবায়ে কেরাম তথা সমগ্র মুসলিম জাতিকে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর মর্যাদা, উম্মতের প্রতি তার ইহসান অবদান এবং কুরবানীর কথা উল্লেখ করে নিদর্শনস্বরূপ নির্দেশ দেন– "মসজিদের দিকের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দাও, কেবলমাত্র আবূ বকরের দরজা খুলে রাখ।"

রাসূল ﷺ-এর এ অসিয়তের কারণে আজও আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সে দরজা খোলা আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে। তাকে রাসূল ﷺ "সিদ্দীক" খেতাবে ভূষিত করেন।

আয়েশা (রা) বিশ্ব মুসলিম নারী সমাজের জন্য এক অবিস্মরণীয় আর্দশ। তিনি ১৯ বছর বয়সে বিধবা হন এবং ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত একাকী জীবন যাপন করেন। বিশ্বনীর অন্যান্য স্ত্রীর মত আয়েশা (রা)-এর বিবাহও উম্মতের ওপর হারাম করে দেয়া হয়। যৌবনের এ দীর্ঘ মুহূর্তে তিনি পাক পবিত্রতা, শিষ্টাচারিতা, সংযমশীলতা, দূরদর্শিতা, ধৈর্যশীলতা এবং আল্লাহভীরুতার পরিচয় দেন। কোনদিন তিনি স্বামীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। রাসূল ﷺ-এর স্ত্রী হিসেবে অর্জিত সম্মান মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখেন, জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে নবীর স্ত্রীর মর্যাদা লাভের গৌরবকে অগ্রাধিকার দেন। যে সমস্ত নারী যৌবনকালে

বিধবা হয়ে যান এবং মৃত স্বামীর স্মরণে তার এতীম সন্তান-সন্ততির লালন পালনের তাগিদে অথবা তাকদীরের ফয়সালার কারণে অবিবাহিতা জীবন যাপন করতে হয় আয়েশা (রা) তাদের জন্য উজ্জ্বল আদর্শ। আয়েশা (রা) প্রমাণ করেছেন যে, নারী সমাজ অতি মহান, তারা বস্তু পরাধীন নয়, তারা লোভাতুর নয়, তারা যৌবনের লাগামকে নিয়ন্ত্রণ করতে সুসক্ষম।

আয়েশা (রা) ছিলেন বিশ্বনবীর পর বিশ্বজগতের প্রধান ব্যক্তিত্ব আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর কন্যা। ভদ্রতা শিষ্টাচারিতা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, আন্তরিক পবিত্রতা এবং ঈমানী শক্তির প্রশ্নে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর উত্তরসূরী। বিবাহিত জীবনে নবীর সান্নিধ্যে, অহীর পরশে স্বয়ং রাসূলের সাহচর্যে সরাসরি বস্তু বিরাগিতার শিক্ষা গ্রহণ করেন। বস্তু সামগ্রী অথবা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে গ্রহণের কথা স্ত্রীদেরকে বলা হলে মাতা-পিতা এবং মুরুব্বীদের পরামর্শ গ্রহণ উপেক্ষা করে আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল ও আখেরাতকে গ্রহণের কথা সকল স্ত্রীদের পূর্বে আয়েশাই প্রথম ঘোষণা করেন। তিনি বয়সে ছোট হতে পারেন কিন্তু সেদিন তিনি নজীরবিহীন বুদ্ধিমত্তা, মেধা এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। আল্লাহ আয়েশা (রা) এবং নবীপত্নী সকলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

প্রসঙ্গত: এখানে পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়দের সাথে রাসূল ﷺ-এর আচার-ব্যবহার, চলাফেরা, উঠাবসা, কথাবার্তা, জীবন যাপন প্রণালী কেমন ছিল তা বর্ণনা করা যেতে পারে। তার জীবন ধারণ উপকরণ ছিল খুবই স্বাভাবিক। তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ গ্রহণ না করার বিষয়টি সকলকে অবাক করে রাখত। কৃচ্ছতা অবলম্বন ছিল তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

আয়েশা (রা)-এর সূত্রে উরওয়া বলেন, রাসূল ﷺ-এর ঘরে মাসের পর মাস আগুন জ্বলত না, শুধুমাত্র খেজুর এবং পানির উপর যথেষ্ট করা হতো। হ্যাঁ কোন কোন সময় আনসারী সাহাবীগণ দুধ পাঠাতেন যা তিনি এবং তার পরিবার-পরিজন পান করতেন। রাসূল ﷺ-এর এ অবস্থা অভাব-অনটনের কারণে নয়, কারণ তিনি বিশ্ব বিজয়ী ছিলেন, গনীমতের মালসহ রাষ্ট্রীয় কোষাগারেরও তিনি একচ্ছত্র অধিকারী ছিলেন। উম্মতের বেশুমার অর্থ সামগ্রী

তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু তাঁর হাত ছিল সম্পূর্ণ প্রশস্ত। তাই সবকিছুই তিনি গরীব মিসকীনদের স্বার্থে ব্যয় করে দিতেন, দান-খয়রাত করে দিতেন।

জাবের (রা) বলেন, রাসূল ﷺ কোন প্রার্থনাকারীকে ফেরত পাঠাতেন না।

আনাস (রা) বলেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট যে কেউ প্রার্থনা করত সে এমনকি কোন কাফেরও প্রার্থনা করে বিমুখ হয়ে ফিরেনি।

একবার জনৈক কাফের রাসূল ﷺ-এর দরবারে প্রার্থনা জানালে অসংখ্য বকরী দিয়ে তার নিকট ওজরখাহী করেন। কাফের লোকটি ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। সে রাসূল ﷺ-এর দান-খয়রাতের প্রশস্ততা দেখে অনুপ্রাণিত হয় এবং স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদেরকে একত্রিত করে বলেন, হে লোকসমাজ! তোমরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে তোমাদের অভাব-অনটন দূরীভূত হবে। এভাবে অনেক লোক অর্থ সম্পদের লোভে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিন রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের সাহচর্যে থাকার পর তাদের অন্তর থেকে বস্তু আকর্ষণ সমূলে নির্মূল হয়ে যেত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ইসলামের আক্বীদা বিশ্বাস তাদের অন্তরে সুদৃঢ় হতো। বস্তু সামগ্রী ও বস্তু আকর্ষণ পরিহারের এই অপূর্ব আদর্শ তিনি এবং তার পরিবার-পরিজনের নজীরবিহীন বৈশিষ্ট্য।

এ পৃথিবী এর শোভাসামগ্রী যে ক্ষণস্থায়ী আর ঈমান আমলের প্রতিফল ও আখেরাতের জান্নাত যে স্থায়ী এবং চিরস্থায়ী একথা তার ভালো করেই বিশ্বাস ছিল। তাই তিনি আখেরাতের এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী ভোগ সামগ্রী লাভের কামনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী বস্তুসামগ্রী বর্জন করার উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করেন, মানব জাতিকে এ আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত করেন এবং তার দিকে আহ্বান জানান।

ফকীর মিসকীন এবং অভাবগ্রস্ত লোকেরা বিশ্বনবী ﷺ এবং তার পবিত্র পরিবার-পরিজনকে এমন অভাবগ্রস্ত এবং সম্বলহীন দেখতে পায় যার কোন নজীর নেই। অপরপক্ষে ধনাঢ্য সমাজ নবী করীম ﷺ ও তার পরিবার-পরিজনের সংযমশীলতা, কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন পরিদর্শন করে প্রকৃত সাফল্যের সন্ধান পায়।

সংযমশীলতা এবং বিলাসিতা পরিহারের দিক নির্দেশনা লাভ করে গরীব মিসকীনের প্রতি দান-খয়রাতের হাত প্রশস্তকরণে অনুপ্রাণিত হয়। মূলত: আল্লাহ তার নবীকে গরীব ধনী সকলের জন্যই আদর্শ নবী হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। তিনি ইরশাদ করেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ۔

অর্থ: যারা আল্লাহ্ এবং আখেরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা–৩৩ আহ্যাব : আয়াত-৩৩)

রাসূল ﷺ-এর সাথে সীমাহীন অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে কৃচ্ছতা অবলম্বন এবং সংকটময় জীবন যাপন করা প্রথম স্ত্রীদের জন্য অসহনীয় এবং কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সে কারণে সকল স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর দরবারে তাদের কষ্টের কথা ব্যক্ত করেন এবং এ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। কিন্তু রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং কারো নিকট এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এমতাবস্থায় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এবং ওমর (রা) সহ সাহাবায়ে কেরাম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একাধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করে ব্যর্থ হন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আয়েশা (রা)-এর প্রতি এবং ওমর (রা) হাফসা (রা)-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, সাবধান! তোমরা রাসূল ﷺ-কে বিরক্ত কর না এবং তার সামর্থ্যের বহির্ভূত কোন কিছু তার নিকট প্রার্থনা কর না। আয়েশা এবং হাফসা উভয়ই অনুতপ্ত হন এবং ভবিষ্যতে রাসূল ﷺ-এর নিকট কোন কিছু প্রার্থনা না করার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন। এ মুহূর্তে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়–

يٰۤاَيُّهَا النَّبِىُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۔ وَاِنْ

كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۔

অর্থ: হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, তোমরা যদি পার্থিব জীবন এবং তার বিলাসিতা কামনা কর, তবে আস আমি তোমাদের জন্য ভোগসামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদেরকে বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখেরাত কামনা কর তবে তোমাদের মধ্যকার নেককারদের জন্য আল্লাহ মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(সূরা আহযাব : আয়াত–২৮-২৯)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূল ﷺ সর্বপ্রথম সর্বাধিক প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশাকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, হে আয়েশা! আমি তোমাকে একটি কথা বলব, তুমি তোমার মাতা-পিতার পরামর্শ ব্যতীত উত্তর প্রদানে তাড়াহুড়া কর না। আয়েশা (রা) বললেন, সে কথাটি কি? রাসূল ﷺ তাকে আয়াত তিলাওয়াত করে আয়াতের সারমর্ম সম্পর্কে অবগত করলেন। আয়েশা (রা) বললেন, এ ব্যাপারে মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করার কোন প্রয়োজন নেই, আমি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে গ্রহণ করলাম। এরপর পর্যায়ক্রমে রাসূল ﷺ তাঁর সকল পত্নীকে আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করলেন। তারা সকলেই একই পথ অবলম্বন করেন, বস্তু সামগ্রী এবং সহায় সম্পদের উপর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেই প্রাধান্য দেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁরা আর কোন দিন দুনিয়া এবং দুনিয়াবী মরীচিকার প্রতি আকর্ষিত হননি বরং বস্তু বিরাগিতায় নিমগ্ন থাকেন।

আবূ সাঈদ মাকবূরী বলেন, বকরীর ভুনা গোশত নিয়ে লোকেরা আবূ হুরায়রা (রা)-কে পানাহারের নিমন্ত্রণ জানালে তিনি এ বলে নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন যে, রাসূল ﷺ কোনদিন ময়দার রুটি পেট পুরে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করনেনি। এমতাবস্থায় তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল ﷺ ৩০ সা আটার বিনিময়ে স্বীয় 'দেরা' (লৌহ বর্ম) ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখে মৃত্যুবরণ করেন।

এ আলোচনার পর যাদের অন্তর রোগাগ্রস্ত অথবা যারা আল্লাহ এবং রাসূলের চরম শত্রু, তারা ছাড়া আর কেউ রাসূল ﷺ-এর সমালোচনা করতে পারে কি? পারে কি এমন কটূক্তি করতে যার কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ـ

অর্থ: হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।! (সূরা হুজরাত : আয়াত-১)

বস্তুত: ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান এবং ইসলাম প্রবর্তিত শরী'আত স্থান, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য ব্যাপক এবং উপযুক্ত। ইসলামী শরী'আত পিতা-মাতা এবং অভিভাবকদেরকে মোটেই এ অধিকার দেয়নি যে, তারা হীন স্বার্থ অথবা ব্যক্তি ও অর্থ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কন্যাদেরকে কুফুবিহীন বিবাহে বাধ্য করবে। যার যা খুশী তাই করবে এতো নিরেট সীমালংঘন এবং জুলুম। ইসলাম ইনসাফের ধর্ম, কি করে ইসলামে এরূপ অনুমতি থাকতে পারে? কেউ যদি ইসলামকে এই মনে করে তাহলে এটা হবে তার মারাত্মক ভুল। যাতে মানুষ নারী সমাজকে পশ্চিমাদের মতো ভোগবিলাসের উপকরণ মনে না করে এবং যাতে নারী সমাজের আল্লাহ প্রদত্ত সম্মান অক্ষুণ্ন থাকে, এ জন্যই বিবাহ শাদীর ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আতে জরুরি এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এবং বিধি-নিষেধ রাখা হয়েছে। কন্যার মতামত গ্রহণ, কুফুবিহীন বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী বিবাহ-শাদীকে বাতিল বলে ঘোষণা দেয়া, জালেম এবং অত্যাচারী স্বামীর অধিকার খর্ব করে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর মুসলিম কাজীর অধিকার এরই অন্তর্ভুক্ত।

ইসলাম বিশেষজ্ঞ মনীষীগণ বিবাহ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধে স্থান, কাল, পাত্রের নিরিখে আলোচনা করে সে দর্শন এবং যুক্তির বিশদ বিবরণ প্রকাশ করেছেন,

তাতে বিবাহ সংক্রান্ত আইন কানুনে ইসলামী শরী'আতের বৈশিষ্ট্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়। সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামী নিয়ম শৃংখলাই স্থান, কাল এবং পাত্র নির্বিশেষে নারী সমাজের মান মর্যাদা এবং অধিকার সুসংরক্ষণে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্যবস্থাপনা।

তবে ইসলাম নাবালেগা অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্কা ও বয়স্কদের ব্যাপারেও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু তা করেছে প্রয়োজন এবং বিশেষ অবস্থার খাতিরেই। যাতে মানুষ সেখানেই হীন স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ না পায় সেজন্য উপযুক্ত শর্তাবলী আরোপ করেছে। এ সমূহ শর্তাবলী উপেক্ষা করার মোটেই অবকাশ নেই।

সমাপ্ত

তথ্যসূত্র

১. হাদীস চর্চায় মহিলা সাহাবীদের অবদান – ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম

২. আহলে বাইত বা বিশ্বনবীর পরিবার – নাসির হেলাল, সুহৃদ প্রকাশনী

৩. আস্‌হাবে রাসূলের জীবন কথা– মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ; প্রথম প্রকাশ, ১-৩ খণ্ড। বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।

৪. বিশ্বনবীর সাহাবী– তালিবুল হাশেমী; অনুবাদ : আবদুল কাদের, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১-৫ম খণ্ড, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

৫. মহিলা সাহাবী– নিয়ায ফতেহপুরী, আনুবাদ : গোলাম সোবহান সিদ্দিকী, তৃতীয় প্রকাশ- ১৯৯৫; আল ফালাহ পাবলিকেশন্স।

৬. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনীগণ– আলহাজ্জ মৌঃ মোঃ নূরুজ্জামান, দ্বিতীয় প্রকাশ–১৯৯৬, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ।

৭ বিশ্বনবীর দাম্পত্য জীবন– ফজলুর রহমান মুন্সী। প্রথম প্রকাশ– ১৯৮৬। বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী লিঃ, ঢাকা।

৮. আসমাউর রিজাল বা রাবী চরিত– মাইন উদ্দিন সিরাজী, আল-বারাকা লাইব্রেরী, ঢাকা।

৯. আসমাউর রিজাল বাংলা– আবূল মোহছেন আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, প্রথম প্রকাশ– ১৯৯৪, ছাহাবা প্রকাশনী, লক্ষ্মীপুর।

১০. বহুবিবাহ ইসলাম ও মুহাম্মদ ﷺ– আহমদ মনসুর, প্রকাশকাল– ১৯৯৫। তাসনিম পাবলিকেশন্স, মিরপুর ঢাকা।

১১. সংগ্রামী নারী– মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা।

১২. নবী পরিবারের প্রতি ভালোবাসা– মাওলানা মাহমুদুল হাসান, মজলিসে ইলমী, দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা, আগস্ট– ১৯৯৫।

১৩. মহিলা সাহাবী– তালিবুল হাশেমী, আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ– জুন-১৯৯০।

১৪. আর রাহীকুল মাখতুম। প্রকাশক– সোনালী সোপান

১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ, বিভিন্ন খণ্ড – ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৬. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম ২য় খণ্ড – দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর ১৯৮৭। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।